## প্রথম অধ্যায়

# সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : জীবন ও সাহিত্য-পারস্পরিক সম্পর্ক

উপন্যাস এ-কালের সাহিত্যের এক সমৃদ্ধতম ও জনপ্রিয়তম শাখা । উপন্যাস মানেই ঔপন্যাসিকের সামগ্রিক জীবনবোধ ও ব্যক্তি সম্পর্কে অনাগ্রহের সার্থক প্রকাশ । ঔপন্যাসিক মাত্র তাই প্রকাশ করেন যা তিনি প্রত্যক্ষ করেন, জানেন উপলব্ধি করেন বা করতে চান । চোখে দেখে, কানে শুনে, বইয়ে পড়ে, বা অন্য কোন উপায়ে ঔপন্যাসিক যা আহরণ করেন বা যা তিনি হতে চান, করতে চান বা করাতে চান, তাই তিনি শুধু প্রকাশ করেন । আবার অনেক সময় জীবন তথ্যের হুবহু অনুসরণ না থাকলেও লেখকের জীবনের কতগুলো মৌলিক ঘটনা, সমস্যা বা ভাবনা চিন্তার অগ্রগতিও স্থান-কাল পাত্র বদলে লেখক তাঁর উপন্যাসে নিয়ে আসেন । তাই একজন ঔপন্যাসিকের বহু উপন্যাসেই তাঁর ব্যক্তি জীবনের গন্ধ পাওয়া যায় তা সে প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে । শুধু উপন্যাসই নয়, সাহিত্যের যে কোন শাখার ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় - রবীন্দ্রনাথের ‘ছবি’ কবিতা বা ‘নষ্টনীড়’ গল্পে তাঁর ব্যক্তিজীবনের ছাপ রয়েছে । তবে উপন্যাসে যেহেতু জীবনের ব্যাপকতর চিত্র উঠে আসে তাই উপন্যাসের আলোচনাই অধিক হয়ে থাকে । যেমন মীর মোশাররফ হোসেনের ‘গাজী মিয়াঁর বস্তানী’ (১৮৯৯), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘শ্রীকান্ত’ (১৯১৭-৩৩), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ (১৯২৯), ‘অপরাজিত’ (১৯৩২), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ধাত্রীদেবতা’ (১৯৩৯), প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর ‘মহাস্থবির জাতক’ (১৯৪৫), রমাপদ চৌধুরীর ‘প্রথম প্রহর’ (১৯৫৪-৫৫), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘আত্মপ্রকাশ’ (১৯৬৬), শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘কুবেরের বিষয় আশয়’ (১৯৬৭), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘উজান’ (১৯৭১), সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের ‘মায়ামৃদঙ্গ’ (১৯৭২), মৈত্রেয়ী দেবীর ‘ন হন্যতে’ (১৯৭৪), সমরেশ মজুমদারের ‘উত্তরাধিকার’ (১৮৯০) প্রভৃতি। এদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ধাত্রীদেবতা’ বাংলা সাহিত্যে এক শ্রেষ্ঠ আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। ঔপন্যাসিকের কৈশোর এবং যৌবনের কাহিনি এই উপন্যাসের বিষয় । আর সেই জীবন কাহিনি প্রায় তথ্য-নিষ্ঠভাবে উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে । আবার উপন্যাস হিসেবেও এটি

হয়েছে রসোত্তীর্ণ । উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই লাঘাটার জমিদার কৃষ্ণদাসের অকালমৃত্যু হওয়ায় তার পুত্র শিবনাথ মা এবং পিসিমার তত্ত্বাবধানে মানুষ হচ্ছে । স্বামী-পুত্রকে মহামারীতে হারিয়ে পিসিমা শৈলজা বাবার বাড়িতে ফিরেছেন ।তিনি পুরাতন যুগের ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী। তিনি চান শিবনাথ একজন শক্তিমান জমিদার রূপে গড়ে উঠুক । অপরদিকে শিবনাথের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মা জ্যোতির্ময়ী দেবী চান শিবনাথ একজন শিক্ষিত সহানুভূতি-সম্পন্ন এবং উদারচেতা মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠুক । উপন্যাসে শিবনাথ প্রতিদ্বন্দ্বী ছেলেদের সাথে 'যুদ্ধ' করে, দরিদ্র ভান্ডার খোলে আবার বিদ্যালয়েও পড়াশোনায় শ্রেণিতে তৃতীয় হয় । মহামারীতে আর্তের সেবা করতে গিয়ে শিবনাথ পূর্ণ ও সুশীলের সঙ্গে পরিচিত হয় । রামজী সাধুর কাছে সে যুদ্ধের গল্প শোনে, আর রামরতন মাস্টারের কাছে রবীন্দ্রনাথ-মিল্টনের কথা । গ্রামের বিদ্যালয় থেকে সে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে । একই বছরে গ্রামের লক্ষপতি ব্যবসায়ী রামকিঙ্করের মা-মরা ভাগ্নী গৌরী ওরফে নান্তীর সঙ্গে তার বিয়ে হয় । কিন্তু পিসিমা আর নান্তির দিদিমার কলহের ফলে নান্তি মামার বাড়িতেই থেকে যায় । শিবনাথের মায়ের মৃত্যুর পরে কিছুদিনের জন্যে আসে। কিন্তু সন্তানসম্ভবা হলে আবার কলকাতায় চলে যায়। শিবনাথ কলকাতার এক কলেজে ভর্তি হয়। পূর্ণ ও সুশীলের মাধ্যমে সে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে যায় । অবশেষে মোহভঙ্গ হলে সে দেশে ফিরে আসে।

এবার উপন্যাসের কাহিনি এবং তারাশঙ্করের জীবন কাহিনি আমরা যদি পাশাপাশি রেখে বিচার করি তবে বুঝতে পারব যে উপন্যাসে বর্ণিত শিবনাথের কাহিনি আসলে তারাশঙ্করের জীবন কাহিনির এক অন্য পিঠ । লেখক তারাশঙ্করের জন্ম ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে লাভপুরের এক জমিদার বংশে । ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বাবা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মারা যান। এর আগেই তাঁর পিসিমা শৈলজা দেবী মহামারীতে স্বামী-পুত্র হারিয়ে পিতৃগৃহে ফিরে এসেছেন। তিনিও উপন্যাসে বর্ণিত পিসিমার মতই পুরাতন যুগের ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসী। তিনি তারাশঙ্করকে বংশের মান রক্ষার উপযুক্ত জমিদার হিসেবে গড়ে তুলতে চান। আর তারাশঙ্করের মা প্রভাবতী দেবী পাটনার এক শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে । তিনি তারাশঙ্করকে লেখাপড়া শেখাতে চান, দেশ ও দশের মানুষকে ভালোবাসতে শেখাতে চান । ব্যক্তিজীবনেও তারাশঙ্কর খেলাধূলা করেন, গোঁসাই বাবার কাছে যুদ্ধের গল্প শোনেন, নীলরতন মাস্টারের কাছে রবীন্দ্রনাথ-মিল্টনের বিষয়ে জানেন আবার ক্লাসের পরীক্ষায় দ্বিতীয় হন । তিনি গ্রামের দরিদ্র সেবা ভান্ডারের সঙ্গে যুক্ত হন, মহামারীতে আর্তের সেবা করেন ।১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি

গ্রামের বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন । একই বছরে গ্রামের ধনী ব্যবসায়ী ষষ্টীকিঙ্করের ভাগ্নী ফন্টি ওরফে উমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় । কিন্তু তাঁর পিসিমা এবং ফন্টির দিদিমার মধ্যে মন কষাকষির ফলে উমা মামার বাড়ি চলে যান। ব্যক্তিজীবনে তারাশঙ্কর প্রথমে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স এবং পরে সাউথ সুবার্বান কলেজে ভর্তি হন । এই সময়ে তিনি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন । কিন্তু অল্প দিন পরেই গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের দিকে ঝোঁকেন । গ্রামে ফিরে  অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন । পরে ১৯৩০ সালে তিনি গ্রেপ্তার হন । সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের কাহিনি যেন এক অর্থে তাঁর নিজের জীবনেরই কাহিনি । অনেকক্ষেত্রে ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য । যেমন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নষ্টনীড়', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'লালু', শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠীর দেশ', বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'রাণুর প্রথম ভাগ', মহাশ্বেতা দেবীর 'আজীর', 'অপারেশন?-বসাই টুডু', 'এম.ডব্ল্য.বনাম.লখিন্দর', 'চিন্তা', 'জল', 'দ্রৌপদী', 'স্তনদায়িনী', 'পলাতক', 'পাঁকাল', 'গিরিবালা', 'ক্ষুধা', 'ময়নাসতী অথবা একটি অলৌকিক কাহিনী', 'তীর: ১৯৯৩: আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষে', 'রুদালি' প্রভৃতি অনেক গল্পই সরাসরি বাস্তব জীবন থেকে উঠে এসেছে । যেমন দাসপ্রথা অবলম্বনে রচিত হয়েছে 'আজীর' গল্পটি । 'আজীর' শব্দের অর্থ অতি অল্প অর্থের বিনিময়ে আত্মবিক্রয়কারী দাস । শুনতে আশ্চর্য লাগলেও একথা ঠিক ১৯৭৫ সালে এদেশে আইন করে এ দাস প্রথা নিষিদ্ধ হলেও তা আজও নানা নামে ভারতবর্ষে বর্তমান। তবে সত্তরের দশকে এই প্রথা অধিক পরিমাণে ছিল । তখন অনেকেরই জমিজমা ছিল না ,কাজ পেত না । আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মহাজনেরা টাকার বিনিময়ে তাদের ক্রীতদাস বানিয়ে ফেলতেন। যাদের কিছু বা থাকত তাও শেষ পর্যন্ত চলে যেত । মহাজনেরা তাদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে ক্রীতদাস বানিয়ে ফেলতেন । আর বিষয়টা শুধু এক পুরুষেই শেষ হত না । এটি বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে চলত ধারাবাহিকভাবে । এই উত্তরাধিকারসূত্র প্রভু এবং ভৃত্য উভয় পক্ষেই বর্তমান থাকত । মহাশ্বেতা দেবী নিজে পালামৌ-এর সিমড়া গ্রামে এই রকম বহু বন্ডেড লেবার দেখেছিলেন । আর সেই দেখার অভিজ্ঞতা থেকেই লিখেছিলেন 'আজীর' ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি সাহিত্যের যে কোন শাখার সঙ্গেই থাকতে পারে লেখকের ব্যক্তিজীবনের সম্পর্ক । যদিও লেখকের সমস্ত রচনাতেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ছোঁয়া থাকতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই । কিন্তু তবুও একথা

প্রমাণিত একজন সাহিত্যিক বহু ক্ষেত্রেই তাঁর জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনা দিয়েই তৈরী করেন সাহিত্যের কোলাজ । তাই সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতকে শিরোধার্য করে আমরা বলতে পারি-

*''কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ । কবিতা দর্পণমাত্র তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্তি তাহাত আমাদের হাতেই আছে পড়িলেই বুঝিব । কিন্তু যিনি এই কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি প্রকারে এই কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা বুঝিতে হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনা দত্ত প্রধান শিক্ষা এবং জীবনী সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ।''*[১]

বস্তুত যে কোন কবি বা লেখককে বুঝতে গেলে অথবা তাঁর লেখার সঠিক অর্থ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে ভুল হবার সম্ভাবনা প্রবল । কোন লেখকের ব্যক্তিজীবন ও তাঁর সাহিত্যের মধ্যে যখন সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয় তখন স্বভাবতই লক্ষ্য করতে হয় তিনি কোন পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে উঠে এসেছেন। কারণ মানুষের পারিবারিক মূল্যবোধ, পারিপার্শ্বিক পরিমন্ডল তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ, মূল্যবোধ ও আদর্শ তৈরীতে এক মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করে । প্রকৃতার্থে যে কোন ব্যক্তির জীবন বেদ তৈরী হয় তাঁর ব্যক্তিগত ,পারিবারিক, সামাজিক পরিবেশ ও শিক্ষাদীক্ষার প্রকৃতি ও পরিপ্রেক্ষিতে । তাই স্বাভাবিকভাবেই এক্ষেত্রে আমরা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের সাহিত্যকে অধিকতর গভীরভাবে বোঝার জন্য দৃষ্টি ফেরাব তাঁর আত্মীয় পরিজন ও বন্ধুত্বের পরিমন্ডলের দিকে । একই সঙ্গে লক্ষ্য করব তিনি ঠিক কোন পরিমন্ডলে বড় হয়ে উঠেছেন ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের পিতৃ এবং মাতৃ উভয়কুলের পূর্বপুরুষগণ মুঘল আমলে আরব বা মধ্যপ্রাচ্যের কোনো অঞ্চল থেকে এসে বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করেন । নবাবী আমল থেকেই তাঁর পরিবার ছিল উচ্চ-শিক্ষিত, সংস্কৃতি সম্পন্ন, বিত্তবান এবং অভিজাত পরিবারগুলোর মধ্যে একটি। নবাবী আমলেও তাঁর পূর্ব-পুরুষগণ উচু সরকারী পদে আসীন ছিল। পরবর্তীতে ইংরেজ শাসনামলে বহু বনেদি মুসলমান যখন ধর্মীয় কুসংস্কারে অন্ধ হয়ে ইংরেজি শিক্ষা বর্জন করে নিজেদের পতন ডেকে আনে তখন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের পিতৃ-মাতৃ উভয়কুলই আধুনিক শিক্ষাকে উপেক্ষা না করে নিজেদের সামাজিক অবস্থান রক্ষা করে দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। তবে সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার হলেও ওয়ালীউল্লাহের পরিবারে

ইসলামি মূল্যবোধ এবং মুসলমানি শিষ্টাচারের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ধর্মী খাঁটি বাঙালিয়ানার কোন বিরোধ ছিল না।

পৈত্রিক দিক থেকে তিনি পেয়েছিলেন এক অসাম্প্রদায়িক উদার মানবতাবাদী শিক্ষা । এরকম এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ই আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন । স্থান বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম শহরের নিকটবর্তী ষোলশহর নামক গ্রাম । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের পিতা সৈয়দ আহমদউল্লাহ্ ছিলেন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট । তৎকালীন সময়ে পূর্ববঙ্গের খুব কম মুসলমান পরিবারেই তাঁর মত উচ্চশিক্ষিত খুঁজে পাওয়া যেত । তিনি ১৯১২ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এ. (উচ্চ মাধ্যমিক) পাশ করেন। পরবর্তীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৭ সালে ইংরেজিতে এম.এ. পাশ করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন মহকুমায় এস .ডি. ও. হিসেবে কর্তব্য পালন করার পরে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বর্ধমানের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন এবং পরের বছর একই পদে ময়মনসিংহে বদলী হন । ময়মনসিংহে কর্তব্যরত অবস্থায় তিনি পরিপাক যন্ত্রে আলসারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতা যান এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের সহোদর-অগ্রজ সৈয়দ মোহাম্মদ নসুরুল্লাহও ছিলেন উচ্চশিক্ষিত । তিনি এম.এ. এবং বি.এল. পাশ করে বাংলাদেশের সরকারের উচ্চ পদের চাকরি গ্রহণ করেন । পরবর্তীতে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি কানাডার ওন্টারিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন । পূর্বেই বলেছি পিতৃকুলের মত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের মাতৃকুলও ছিল উচ্চশিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত পরিবার ।তাঁর মাতামহ মৌলভী আব্দুল খালেক ছিলেন মুন্সী হাসমতউল্লাহ মুন্সেফের পৌত্র । মৌলবি আব্দুল খালেক ১৮৯৪ সালে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন । ১৯০২ সালের শেষের দিকে তিনি মুন্সেফ পদে নিয়োজিত হন এবং পরবর্তীকালে সাব জজ হয়ে অবসর গ্রহণ করেন । মৌলবি আব্দুল খালেকের দ্বিতীয় সহোদর মৌলবি সালেহ্ আহমেদও ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র । তিনি ১৯০১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অনার্সসহ বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সাব-কালেক্টররূপে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন । পরে ১৯১১ সালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগদান করেন । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের বড় মামা খান বাহাদুর মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের ভারপ্রাপ্ত আইন সচিব এবং একজন অবসর প্রাপ্ত জেলা জজ। এছাড়া নতুন প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের

তিনি ছিলেন দ্বিতীয় সহ-সভাপতি । এরকম এক উচ্চশিক্ষিত এবং সাহিত্যানুরাগী পরিবারের সন্তান ছিলেন ওয়ালীউল্লাহ্‌র মা সৈয়দ নাসিম আরা খাতুন (১৯০৩-১৯৩০)। স্বাভাবিকভাবেই তিনিও ছিলেন বিশেষ সুরুচিসম্পন্ন । বলা হয়ে থাকে একজন শিশুর কাছে প্রথম বিদ্যালয় তাঁর পরিবার, যে বিদ্যালয় থেকে একজন শিশু তাঁর পরবর্তী জীবনে এগিয়ে যাওয়ার রসদ অর্জন করে থাকে । ওয়ালীউল্লাহ্‌র ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তিনিও তাঁর শৈশব-কৈশোর থেকে জীবনের নানা প্রয়োজনীয় রসদ গ্রহণ করেছেন । ব্যক্তিজীবন তাঁর পরবর্তী জীবনে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে । যেমন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র যখন মাত্র আট বছর বয়স তখন তাঁর মাতা নাসিম আরা খাতুন পরলোক গমন করেন । পিতা সৈয়দ আহমদ অতঃপর ১৯৩২ সালে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন টাঙ্গাইল জেলার করোটিয়ার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে । তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই মাতৃহীনতার একটা গভীর দুঃখ চিরকাল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র অন্তরে একটা ফল্গুধারার মত বহমান ছিল । বলা হয়, মাতৃচ্ছায়া, তাঁর সান্নিধ্য ও সাহচর্য সন্তানের পরম আশ্রয়, তার অন্তর্গত প্রতিভা বিকাশের সবচেয়ে সহায়ক শর্ত ও অনুকূল উপাদান । কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁর জীবনে মাতৃস্নেহের সেই অন্তরঙ্গ মমতার পরশ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন । অনেকটা কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মত । যদিও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মত মাতৃহীনতার নেতিবাচক প্রভাব তাঁর মধ্যে পড়েনি । তবুও একটি প্রচ্ছন্ন অভাববোধ, মায়ের আকস্মিক মৃত্যুজনিত নৈঃসঙ্গানুভূতি অতি অল্পবয়সেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মধ্যে সঞ্চারিত হয় । তাই পরবর্তী জীবনে লেখা তাঁর বহু গল্পেই আমরা মাতৃহীনতার কথা, মাতৃহীন শিশুর কথা বারবার ঘুরে ফিরে আসতে দেখি । ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ-বার্ষিকীতে ছাপা (১৯৩৯) তাঁর প্রথম গল্পটিই এক মাতৃহীন শিশুকে নিয়ে লেখা । মাত্র সতেরো বছর বয়সে লেখা 'সীমাহীন এক নিমেষে' নামক এই গল্পটিতে বাস্তবিকপক্ষেই তাঁর আত্মজৈবনিক উপাদান এসেছে । মাতৃহীনতার যে বেদনা তিনি আশৈশব অন্তরে লালন করে এসেছেন তারই বিষাদময় প্রকাশ ঘটেছে এই গল্পে। কিশোরমনস্তত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক তাঁর নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকেই ব্যবহার করেছেন । কাহিনির নায়ক 'শিশু' কল্পনায় নিজের মায়ের কল্যানী মূর্তি আঁকতে ভালোবাসে। শিশুর মা মৃত হলেও সে ভাবে তার মা বেঁচে আছে । তাই অপরের কাছে সে তার মায়ের কথা বলে- কখনও বলে মায়ের অসুখের কথা, আবার কখনও সে মা-কে নীল শাড়ি পড়ানোর সাধের কথা বলে --

*'' ও তাকিয়ে আছে আমার পানে, -স্বচ্ছ চোখ দুটিতে কৌতূহলের ছায়া ।*

*ভালো করে বালিশটা জড়িয়ে নিয়ে বললুম-*

*'নাম কি তোর'?*

*একবার ঢোক গিলে কম্পিত মৃদুস্বরে বললে-*

*'শিশু'।*

*দূর থেকে ভেসে-আসা অপূর্ব বাঁশির মত লাগল নামটা । চমৎকার ! এ-যেন তার দেহের ভাষা !*

*.....*

*হঠাৎ শিশুর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল । অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকলে, 'বাবু' !*

*কেমন যেন চমকে উঠলুম । অজানা আশঙ্কায় মনটা দুলে উঠল । পুকুরের স্থির জলে কে যেন একখন্ড পাথর ছুড়ে হঠাৎ আলোড়িত করে তুলল ।*

*প্রশ্ন করলুম, 'কী রে' ?*

*কিছু বললে না, কিন্তু কান্নার আবেগে ওর নাকের ডগাটা কাঁপছে । অবশেষে কান্না থামিয়ে বললে-*

*'আজ দুদিন মার আমার বড্ড অসুখ, টাকার অভাবে ওষুধপথ্যি দিতে পারছিনে । দুটি টাকা ধার দিতে পার আমায় ?*

*মনটা আমার হঠাৎ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল । পাঁচটি টাকা হাতে দিয়ে বললুম, -*

*'নে, ও ধার-টার কিছু নয়, -আরো যদি লাগে তো বলিস আমায় ।'*

*তার জলভরা চোখের ভেতর মধুর হাসি ঝিকমিকিয়ে উঠল,-অবিশ্রান্ত বর্ষণের পর ঝলমলানো রোদ ওঠার মতো ।*

*চলে গেল শিশু,*

*ঝড় তখন থেমে গেছে !.....''*[২]

এ ঘটনার দুদিন পরে এসে শিশু লেখককে জানায়--

*'' 'মার অসুখ সেরেছে ।'*

*বুকটা আমার ভরে উঠল ।*

*মার অসুখে তার বড্ড ভয় হয়েছিল, -সারা রাতদিন এক মুহূর্তের জন্যেও সে মায়ের পাশ থেকে নড়ে নি। মা যেন লতিয়ে গেছেন বিছানায় । সারা দেহ যেন মূর্ছিত, স্তব্ধ কালো চোখ দুটি ক্লান্তিতে ভরা, আর শুভ্র দেহটি ছিল তৃপ্ত ।*

*মায়ের অপরূপ মূর্তি । শুভ্র কাপড় পরা শুভ্র দেহটির মনোরম কান্তি । সারা মুখের স্নিগ্ধ দীপ্তির মাঝে বৃহৎ কালো চোখ দুটি গভীর, শান্ত ও উজ্জ্বল । আর অম্লান দেহটি যেন শেষরাতের জ্বলজ্বল শুকতারা !*

*শিশুর অনুযোগ, মা শুধু সাদা শাড়ি পড়ে । ওর আজন্মের সাধ, মাকে একবার রঙিন শাড়ি পড়াবে, মেঘমুক্ত উজ্জ্বল নীল আকাশের মত হবে শাড়ির রং ।*

*শিশুর চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল । ঠোঁটের কোনায় হাসির আভা ঝিকমিক করে উঠল । বললে,-*

*'আচ্ছা বাবু, মাকে তুমি কল্পনা করতে পার ?'*

*সারা মুখ তার আনন্দে টলমল করছে ।*

*কিন্তু হঠাৎ পুকুরের স্বচ্ছ জলে পড়ল উড়ে-যাওয়া মেঘের কালো ছায়া । চোখদুটি তার ছলছল করে উঠল । বুঝলুম ।*

*একটা হালকা নীল শাড়ি কিনে দিলুম । সে নাচতে নাচতে চলে গেল-যেন একটা আনন্দের হাওয়া-ভরা কান্না উড়ে গেল ।''*[৩]

এভাবেই দিন চলে যাচ্ছিল । কিন্তু গোল বাঁধায় লেখকের এক বন্ধু । তিনি লেখককে জানান শিশুর মা-বাবা কেউ নেই । তখন লেখক শিশুকে ভুল বোঝেন । প্রথমে দুর্বলতাবশত শিশুকে কিছু জিজ্ঞেস করতে না পারলেও একদিন কঠোরভাবে শিশুকে জিজ্ঞেস করেন--

*'' 'সত্যি করে বল শিশু-তোর মা আছে ? '*

*শিশুর মুখ মুহূর্তে পাণ্ডুর হয়ে গেল, ফ্যাকাসে.....সামনের দেয়ালের মতো সাদা । চোখদুটি তার ভীতিচঞ্চল, আর ঠোঁট-দুটি অস্বাভাবিকভাবে কাঁপছে ।*

*হঠাৎ সে অদ্ভুত স্বরে বললে,-*

*'আছে'-*

*তারপর পালিয়ে গেল দমকা হাওয়ার মতো-সবকিছু যেন অকস্মাৎ ওলট-পালট করে দিয়ে। বৃষ্টির একটানা ঝমঝমানি সুর আমায় অসলভাবে শুইয়ে রেখেছে । স্বপ্নাবিষ্ট চোখদুটি আমার ঘুরে বেড়াচ্ছে হারানো দিনগুলোর কোনায়-কোনায়-যেখানে ব্যথার রাশ জমা রয়েছে। মনে*

*পড়ছে-এমনি বাদলা দিনে কে কবে বলেছিল একটি দুঃখের কথা, কে ফেলেছিল এক ফোঁটা চোখের জল ।*

*কাগজ হাতে এসে ঠেকল-*

*'বাবু।'*

*করুণ কণ্ঠস্বর-যেন তেপান্তর হতে ভেসে -আসা । চমকে উঠলুম । একদিনে কি শুকিয়েছে ছেলেটা !*

*আরো একটা কী যেন হাতে এসে ঠেকল,-কাগজে মোড়া নীল শাড়িটা, আর একটা পাঁচ টাকার নোট । দিয়ে সে কুণ্ঠতভাবে চলে যাচ্ছিল ।*

*ডাকলুম,-*

*'শিশু!'*

*হাত দিয়ে স্পর্শ করলে প্রজাপতি যেমন কেঁপে ওঠে, তেমনি সে কেঁপে উঠল । তারপর কান্না আসবার আগে যেমন করে রুদ্ধ নিশ্বাসে লোকে কথা বলে, তেমনিভাবে কটা কথা সে এক নিশ্বাসে বলে ফেললে-*

*'মিথ্যে কথা বলেছিলেম আমি, মা নেই আমার । কিন্তু মাকে অমনি করে ভাবতে আমার খুব ভালো লাগে বাবু.....মিথ্যে কথা বলছিনে, বিশ্বেস কোরো ।'*

*অনেক কিছু তার যেন বলবার ছিল, বলতে পারলে না ।তবু মনে হল, তার ঐ না-বলার ভেতরেই সব কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়ে গেছে ।''*[৪]

শৈশবে হারিয়ে যাওয়া মাকে নিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যে কল্পনার জাল বুনতেন সেই কল্পনার জাল দিয়েই তিনি হয়ত শিশু চরিত্রকে সৃষ্টি করেছিলেন । যে স্বপ্ন-কল্পনায় বারে বারেই খুঁজে ফেরে তার মৃত মা-কে । এই মাতৃহীনতার কথা, মাতৃহীন শিশুর কথা আমরা শুধুমাত্র তাঁর প্রথম দিকের রচনাতেই নয় পরবর্তীকালের রচনাতেও পাই । যেমন -'পাগড়ি', 'কেরায়া', 'স্তন', 'নানির বাড়ির কেল্লা' প্রভৃতি গল্পগুলোতে মাতৃহীন শিশুর কথা বলা হয়েছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 'দুই তীর ও অন্যান্য' গল্পগ্রন্থের 'পাগড়ি' গল্পে আমরা দেখি মফস্বল শহরের বড় উকিল মোত্তালেব সাহেব আত্মপ্রতিষ্ঠায় তৃপ্ত, পেশাগত সাফল্যে গর্বিত । কিন্তু জীবনের মধ্যপর্বে পৌঁছে তাঁর মধ্যে জেগেছে গভীর অতৃপ্তিবোধ । কারণ স্ত্রীর মনঃরোগ, মস্তিস্কবিকৃতি । পঞ্চম সন্তানের জন্মের পরই মোত্তালেব সাহেবের স্ত্রীর মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয় । আর সেই থেকে তিনি অন্তরে অসুখী । তাঁর মনে হয়েছে বাইরে তাঁর কর্মবহুল জীবন

তাঁকে যশ-মান-অর্থ দিলেও তাঁর ব্যক্তিজীবন তাঁকে নির্মমভাবে বঞ্চিত করেছে । এতো কাল এ অবস্থা সহ্য হলেও এখন আর তিনি সহ্য করতে পারছেন না । জীবনের মধ্য-পর্বে এসে জীবনকে উপভোগ করবার ইচ্ছা তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে জাগ্রত হয়েছে । আর সেই উপভোগ করার ইচ্ছা থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পুনরায় বিবাহ করার । তিনি শুধু নিজের কথাই ভেবে গেছেন, কিন্তু একবারও জানার প্রয়োজন মনে করেন না যে তাঁর এ বিবাহে তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের মত আছে কিনা । অত্যন্ত সহজ-সরলভাবেই তাঁর সন্তানদের জানান যে তিনি তাদের জন্য নতুন মা আনতে যাচ্ছেন । মাঝ-বয়সি পিতার এ সিদ্ধান্ত ছেলে-মেয়েদের মধ্যে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ক্ষোভ ও বেদনার জন্ম দিলেও তারা সংযম হারায় না । কিন্তু তাদের সেই সংযমের মধ্যেই ফুটে ওঠে তাদের অন্তরের বেদনা-

*''তিনি যখন যমুনার ওপর বজরার দোলায় ঈষৎ দোলেন, তখন তাঁর বাড়িতে একটা গভীর নীরবতা নাবে ।ছেলেরা নিশ্চুপ । এমনিতে তারা স্বল্পভাষী; মুখের চেয়ে মনেতেই বেশি কথা বলে তারা । আজ তারা একেবারেই নির্বাক । কেবল একবার বাইরে তারা নিঃশব্দে পায়চারি করে । ছোট ছেলেটি উঠানে একটা শিমগাছ পুতেছিল । তার গোড়ায় বসে সে কিছুক্ষণ একটা কাঠি দিয়ে অকারণ মাটি খোঁড়ে । বড় ছেলেটি হঠাৎ একটি কঠিন অঙ্কের সমস্যা নিয়ে , শেষে মস্ত মানচিত্রের বইটা খুলে একটি মহাদেশের সীমারেখা অনুসরণ করে । তাদের দুটি বোন গভীর মনোযোগ সহকারে সেলাই করে; তৃতীয়টি বালিশে মুখ গুঁজে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে । নীরব নিস্তব্ধ বাড়িতে কেবল একটা নামহীন অশরীরী অস্তিত্ব কেমন একটা ছায়া বিস্তারিত করে রাখে। কখনো-কখনো তাদের পাগলী মা অর্ধসংবিৎ ফিরে পান । তখন তিনি থেকে-থেকে ছেলেমেয়েদের পানে এমনভাবে তাকান যে মনে হয় তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন, বহুদিন পরে আবার আপন সন্তানদের দেখছেন চোখ ভরে । আজ বোধহয় এ-অজাগতিক নিঃশব্দতার মধ্যে হঠাৎ তিনি অর্ধসংবিৎ ফিরে পান । প্রথমে তবু চোখে কিছু বিভ্রান্ত ভাব ও অস্তিরতা থেকে যায় । তারপর মেজো মেয়ের দিকে তিনি যখন তাকান, তখন তাঁর চোখে একটি সুস্থ সন্ধানী তীক্ষ্ণতা জেগে ওঠে ।*

*দাঁত দিয়ে সুতা কাটতে গিয়ে মায়ের দৃষ্টি মেজো মেয়ের নজরে পড়ে । পড়তেই সে কেমন স্তব্ধ হয়ে যায় । কথা বলতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে সংযত করে । কেবল তার সারা অন্তর ডুকরে কেঁদে ওঠে । মনে-মনে সে বলে: মা, আমাকে তুমি চিনতে পারছ ?*

*মায়ের চোখ নড়ে না; তাতে অবশেষে কেমন আবেশ জমে ওঠে । তার ইচ্ছা হয়, ছুটে গিয়ে মায়ের কোলে মুখ গুঁজে পুনর্মিলনের আনন্দে অবাধে কাঁদে ।কিন্তু সে নড়বার শক্তি পায় না । তবে এই সময়ে তার মা বিস্তীর্ণ নীরবতায় তীক্ষ্ণ দাগ কেটে হেসে ওঠেন । সে-হাসি অতি কর্কশ হলেও তা অচেতন বলে দুনিয়া-ছাড়া মনে হয় । বাইরের লোক হয়ত কানে আঙ্গুল দিত, কিন্তু মেয়ে নির্বাক হয়ে শোনে সে-হাসি । কেবল ঝলকে ঝলকে তার চোখের রং বদলায় । কান্না আসে না । এলে হয়ত ভালোই হত ।'*[৫]

'কেরায়া' গল্পটিতেও খুব স্বল্প পরিসরে এক এতিম ছেলের কথা পাওয়া যায় । 'স্তন' গল্পটিতে রয়েছে এক মাতৃহীন শিশু এবং এক সন্তানহীন এক মায়ের কথা । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের বহু গল্পে আমরা যেমন মাতৃহীন শিশুর কথা বার বার পাই তেমনি আবার কিছু গল্পে পাই সন্তানহীন মায়ের কথা । এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় 'খন্ড চাঁদের বক্রতায়' গল্পটির কথা । গল্পটি মূলত শেখ জব্বার নামক এক ব্যক্তির চতুর্থ বিবাহের পটভূমি অবলম্বনে রচিত । গল্পে আমরা দেখি শেখ জব্বারের চতুর্থ বিবির আগমন তার তিন সতীন খুব একটা ভালোভাবে মেনে নেয় না । হিংসার আগুনে জ্বলে তারা মাত্র বার বছরের নতুন বিবিকে নানাভাবে জ্বালাতন করতে থাকে । যদিও মাত্র বার বছরের কোন বাচ্চা মেয়েকে 'বিবি' নামক এক ভারিক্কি শব্দে সম্বোধন করাটা কতটা যুক্তিপূর্ণ সে সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই যায় । শেখ জব্বারের তিন বিবিই তার সম্পর্কে মুখর । অপরদিকে মেয়েটির ঠোঁট অদ্ভুতভাবে নিষ্কম্প । কিন্তু তার চোখের তা বলে বিশ্রাম নেই । ঠোঁটে কোন কথা না থাকলেও চোখ কেবলই সারা ঘরময় ঘুরপাক খাচ্ছে । এক মুহূর্ত তার বিশ্রাম নেই । দৃষ্টি তার ক্ষণে-ক্ষণে দশদিক ঘুরছে । একবার বড় বিবির মুখের পানে, একবার মেজো বিবির হাত নাড়ার পানে তো অন্যবার সেজো বিবির ঠোঁট-বাঁকানোর পানে, আবার কখনো তিন বিবির কুটিল চোখের পানে; এবং তাদের প্রতিটি অক্ষর এবং প্রত্যেকটি দেহভঙ্গি সে নীরবে হজম করে ফেলেছে । যেমন-

*''ওঁর পাশে গাঁ ঘেষে বসেছে তৃতীয় বিবি । মনে তার রূপের অহঙ্কার, তাই নবাগতার পাশে বসে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে তাকে, দেখছে আর থেকে-থেকে মুখ ফিরিয়ে আর-আর বিবিদের পানে চেয়ে চোখ টিপে কিছু-একটা মন্তব্য করছে । এবার ভালো মানুষের মত তার পানে চেয়ে সে দেহ দিয়ে তার দেহ ঠেলে প্রশ্ন করল:*

*-এ্যাদ্দিন যে তোর সোহরকে ছেড়ে ছিলি,মনে কষ্ট হয় নি?*

*মেয়েটি শুধু চোখ ফিরিয়ে চাইলে তার পানে, কিছু বললে না । কিন্তু তাতে কিছু এসে গেল না, কারণ যথাসময়ে যথা-উত্তর দিল দ্বিতীয়া ।-মনে করিয়ে দিয়ে আর ওকে বেচায়েন করিস না; এখন*

*-তো ওর সুখের দিন । একটু পরে তৃতীয়া বিবি ফের তার দেহে ঠেলা দিয়ে শুধাল:*

*-ও নয়া বিবি, জেরা হা কর তো দেখি ?*

*-কেন,দাঁত দেখবি ?*

*-না জিব ।*

*কয়েক মুহূর্ত পরে হাসির হুল্লোড় পড়ল তাদের মধ্যে । শেষে প্রথম বিবি বললে : তাই তো, বোবা লাচার নাকি নয়া বিবি ? দেখি, জেরা হা কর তো ? মেয়েটির নিষ্কম্প ঠোঁট তেমনি রইল, চোখ কেবল ঘুরছে ।*

*প্রথম বিবি কিছুটা আশ্বস্ত হল, কিন্তু কিসে কে জানে । চোখ টেনে বললে :*

*-নয়া বিবির বড় খাওফ মালুম হচ্ছে । তাই না বিল্কিচ বহিন ?*

*-বিবি!বিবি কেয়া, বোলনা বেগম ! দ্বিতীয়া হঠাৎ সবাইকে ধমকে উঠল ।*

*-হাঁ ভাই, বেগম! বাদশাকা বেগম !*

*-ঘোড়েকা বাদশা-ইয়ে ভী এয়াদ রাখ্না !*

*-আহ্, তৃতীয়া বিরক্ত হবার ভান করল, আদব্সে বাত কর্না !*

*-হাঁ হাঁ,আদব্সে বাত কর্না । ঘোড়েকা বাদশা, উনকা পেয়ারা বেগম, উনকি সাথ আদব্সে বেয়াদবি কর্না ঠিক হ্যায় । হ্যায় না গুলবহিন?- আর গুলবহিনের মুখে তখন হাসির পেশোয়ারি-গুল ফুটেছে ।*

*বাইরে আনন্দের আগুন জ্বলছে, এখানে জ্বলছে হিংসার আগুন । হিংসা বিদ্বেষ এদের ধর্ম, এবং এরই উত্তাপে তারা বেঁচে থাকে: তাদের দেহে -তো সূর্যের আলো পৌঁছায় না । প্রত্যেকের ঠোঁটে কুটিল হাসি, সে-হাসির তলে জ্বালা, এবং এ-জ্বালা সঞ্জীবনী । পয়লা বিবি আস্তে বললে:*

*-বিবি কি খুবসুরত যেন আসমানের তারা !*

*-হাঁ বহিন, বেহেশতকা হুরী, বিলকুল সাচ্চ বাত ।*

*দ্বিতীয়া আবার তার দেহে ঠেলা দিলে । বললে: --*

*বাতচিৎ কিছু কর তো..... ঘোড়েকা বাদশাকে খুউব পছন্ হয়েছে কি?*

*তৃতীয়া যেন হঠাৎ বিরক্ত হয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল: --*

*আহ ওকে দিক করিস্ না বহিন । ঘোড়েকা বাদশার জন্যে দিলের মধ্যে সব মহব্বতের বয়েৎ বাৎলে নিতে দে .....''*[৬]

প্রকৃতপক্ষে এরা মেয়েটিকে এমন কিছু না বললেও তারা বলছে অনেকক্ষণ ধরে, আর বলছে তিন জন মিলে । তাই ছোট মেয়েটিরও ধৈর্য্যের বাঁধ এক সময় ভেঙ্গে যায় । সে হঠাৎ করেই ক্ষিপ্ত হয়ে পাশে বসে থাকা তৃতীয়া বিবির অনাবৃত বাহুতে সজোরে তার ইঁদুরের মত তীক্ষ্ণ দাঁত বসিয়ে দেয় । আর এর জন্যই হয়ত বাকি সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। কাল বিলম্ব না করে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে বস্ত্রসার ক্ষুদ্র মেয়েটির ওপর, তারপর চুল টানাটানি হাতাহাতি এবং তার সঙ্গে কুৎসিত অশ্রাব্য গালাগাল অবিরাম চলতে থাকে । আর তাদের দাঁত ও চোখ বাঘিনীর মতো ধারালো ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । আসলে সংসারে এদের অবস্থান অনেকটা আকাশের মহারাত্রি এবং দূর তারকার দেশের মহানীরবতা ও নিষ্কলঙ্ক ম্লান দিপ্তির মত । সেখানের হাওয়াশূন্য পবিত্রতায় এই ধরণীর কলঙ্ককালিমা পৌঁছায় না, আবার সেখানকার অকলঙ্কনির্মলতাও এ ধরণীকে স্পর্শ করে না । এ-দুটি পরস্পরের পানে হয়তো-বা কখনো চোখ তুলে চেয়ে দেখে, কিন্তু সে তাকানো নিষ্ফল হয় এই কারণে যে, তাদের মাঝে মহাদূরত্বের ব্যবধান । এবং হয়তো এই ব্যবধানই সৃষ্টির রহস্য ও অর্থ । তাই এরা জিঞ্জির চায়, মুক্তি চায় না । তবে একথাও চিরসত্য যে রাত্রির কালো অন্ধকার কখনও সূর্যের কিরণকে স্থায়ীভাবে ঢেকে দিতে পারে না । একটি নির্দিষ্ট সময় পরে তা আত্মপ্রকাশ করবেই। তাই প্রথমে নতুন বিবির প্রতি যতই বিদ্বেষ পোষণ করুক না  কেন সেই ছোট মেয়েটির উপর সবাই যখন ঝাঁপিয়ে পরে নিজেদের রাগ মেটাচ্ছিল তখন তার দুরবস্থা দেখে বড় বিবির হৃদয়ে হঠাৎই অপত্য স্নেহ জেগে ওঠে । তার মনে পরে বহুকাল আগে মৃত তার কন্যা সন্তানের কথা ।

*''নয়া বিবির অলঙ্কার ছিঁড়ে গেছে, কিছু খসে গেছে; তার দাঁতে দাঁত লেগেছে, এবং যে-চোখ অবিরত সেকেন্ডের কাঁটার মত দ্রুত নড়ছিল কেবল, সে চোখ এখন নিমীলিত । তার দেহ হিংসার অনলে বিধ্বস্ত ।*

*পয়লা বিবি কেঁদে উঠল:*

*-এয়া খোদা, মেরি বেটিকী ক্যা হাল হুয়া ?*

*সেই বহু বছরের কথা, হয়তো দশ, হয়তো চৌদ্দ,-পয়লা বিবির তখন প্রথম মেয়েটি জন্মেছিল। সে মেয়ে আর নেই, এখন শুধু তার স্মৃতি আঁকা রয়াছে মায়ের বুকে । তার ঠোঁটটা কি এমনি ছিল, এই নয়া বিবির মতো? আর চিবুকটা, কপালটা ঠিক যেন তেমনি । ঝাউবনে অকস্মাৎ ঝড় উঠল, হু-হু করে বইতে থাকল হাওয়া । পয়লা বিবির অন্তর ঝিরঝির করে উঠল-অসার্থক ও অপূর্ণ মাতৃত্বের বেদনা ও স্মৃতির ভারে ।*

*-এ খোদা, তুনে কেয়া কিয়া.....।''*[৭]

তবে শৈশবে হারানো মায়ের প্রতি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র এই ভালোবাসার কথা স্মরণ রেখেও বলতে হবে যে বিমাতার সঙ্গেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর এবং মাতা-পুত্রের মতই স্বাভাবিক শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় পরিপূর্ণ । একথা আমরা অন্য কারো নয় তাঁর বিমাতার কাছ থেকেই জানতে পারি। তাঁর ভাষায়--

*''দশ বার বছর পর্যন্ত ওয়ালী সারাক্ষণ আমার কাছে কাছে থাকতো । রান্না ঘরে গিয়ে আমার কাছে চুপ করে বসে থাকত ।বলতো,আম্মা আমাকে দিন, আমি তরকারি কুটে দিই। এমন সুন্দর করে শশা-টমাটো কেটে প্লেটে সাজাতো । খাবার জিনিস যেমন-তেমনভাবে টেবিলে সাজানো ওর পছন্দ হত না। বাসার বাইরে কোথাও গেলে আমাকে না জানিয়ে যেতো না । মানিকগঞ্জে থাকতে একমাত্র বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গেই ওর খুব ঘনিষ্ঠতা ছিলো । বুলবুলের সঙ্গে মাঝে মাঝে ধলেশ্বরীর তীরে সন্ধ্যায় বেড়াতে যেতো । কোনোদিন যেতো কারো বাগানবাড়িতে পাখি দেখতে । তখন মানিকগঞ্জ শহর ছিলো হিন্দু-প্রধান। দুর্গা পূজার সময় ছাড়াও সঙ্গীতানুষ্ঠান যাত্রা-থিয়েটার হত মাঝেমধ্যে ।সেগুলোও কখনো দেখতে যেত । তবে সঙ্গে কোনো পিওন বা আরদালি কাউকে দিতে চাইলে বিব্রত বোধ করতো । বলতো, লোকটির ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওখানে দাঁড় করিয়ে রাখা কি উচিত হবে? ছোটোবেলা থেকেই ছবি আঁকার শখ। রং-তুলি কাগজ ছাড়া তাঁর আর কোনো চাহিদা ছিলো না । একটু বড় হয়ে ধরলো বই পড়া । ঘরে যতক্ষণ থাকতো বই পড়তো । সহপাঠীদের বাড়ি থেকেও বই ধার করে আনতো । আমাকে পড়ে শোনাতে বলতো এবং নিজে পড়েও আমাকে শোনাতো ।ছোট ছোট ভাইবোনকে আদর করত প্রাণ দিয়ে। কারো অসুখ-বিসুখ হলে একেবারে অস্থির হয়ে যেত, রাত জেগেও সেবা শুশ্রূষা করতো।''*[৮]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র পারিবারিক প্রেক্ষাপটের কথা পূর্বেই বলেছি । তাঁর পরিবারের সকলেই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত । তাঁদের মধ্যে যার প্রভাব ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপর সবচেয়ে বেশি

পড়েছিল তিনি তাঁর বড় মামা খান বাহাদুর মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম । ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর বাল্য ও কৈশোরে সবিশেষ সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ করেছেন তাঁর বড়ো মামা খান বাহাদুর সিরাজুল ইসলামের । তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রেরণা ও শুশ্রূষা তিনি এই মামার কাছ থেকেই পেয়েছেন । মামা সিরাজুল ইসলামেরই 'কমরেড পাবলিশার্স' থেকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের প্রথম উপন্যাস 'লালসালু' এবং সম্পাদিত সাময়িকী 'কনটেম্পোরারি' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। বাঙালি মুসলমান কর্তৃক সম্পাদিত সাময়িকী 'কনটেম্পোরারি'-র মত আর কোন ইংরেজি সাময়িকী তখনকার সময়ে  এতটা সমৃদ্ধ ছিল না ।

Contemporary -র প্রথম প্রবন্ধটি ছিল কাজী আব্দুল ওদুদের। Modern Bengali Literature প্রবন্ধটিতে তিনি মধুসূদন পরবর্তী আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন । লেখাটি পরে তাঁর "Creative Bengal' (1950) নামক গ্রন্থে অন্যান্য প্রবন্ধের সঙ্গে সংকলিত হয়। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি লিখেছেন জীবনানন্দ দাশ। "Literature and Contributives' নামক প্রবন্ধে তিনি আধুনিক সাহিত্যের সমস্যা আলোচনা করেছেন । তৃতীয় প্রবন্ধটির লেখক ছিলেন ড. এলিক্স এরোনসন । তাঁর প্রবন্ধে তিনি প্রখ্যাত ইংরেজি ঔপন্যাসিক ডি.এইচ. লরেন্সের জীবনী এবং সাহিত্যাদর্শ আলোচনা করেছেন । মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ লিখেছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত উর্দু কবি আলতাফ হোসেন হালী সম্পর্কে । তাঁর প্রবন্ধের নাম 'Hali'। মূলত পরাধীন ভারতবর্ষের পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের পুনর্জাগরণে আলতাফ হোসেন হালীর ভূমিকা এবং মুসাদ্দস-ই-হালী, শিকওয়া-ই-হিন্দ, মুনাজাত-ই-বেওয়া, শিকওয়া-ই-হিন্দ, মুনাজোত-ই-বেওয়া, চুপকে-দাদ প্রভৃতি হালীর অবিস্মরণীয় সাহিত্যকর্মের পর্যালোচনা এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু । "Towards a New Humanism" নামক প্রবন্ধে মূলক রাজ আনন্দ দশকে এম.এন.রায়ের 'নতুন মানবতাবাদ'-কে সম্পূর্ণ নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের মামা খানবাহাদুর সিরাজুল ইসলাম লেখেন "Economic Problem in Eastern Pakistan' নামক প্রবন্ধ । এ প্রবন্ধে তিনি পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) কী কী অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে সে বিষয়ে আলোকপাত করেছিলেন । যা তাঁর দূরদৃষ্টিতারই পরিচয় দেয় । চিত্রকলা সম্পর্কে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের আগ্রহের কারণেই সম্ভবত চিত্রকলা সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধ সাময়িকীটিতে প্রকাশিত হয়েছিল । যথা- মিনিয়েচার সম্পর্কে ওয়াদিয়া আজিজের-- "Miniature Mughal Painting' এবং কমলেশ ব্যানার্জিরড্ড 'Self -determination in

Russia'। প্রবন্ধ ছাড়াও সাময়িকীটিতে কবিতা ছিল মোট পাঁচটি । এদের মধ্যে চারটি কবিতাই ছিল অনূদিত রচনা । তিনটি রুশ এবং একটি বাংলা কবিতার ভাষান্তর । 'History of a Crisis With Beauty' নামক একমাত্র মৌলিক কবিতাটি লিখেছিলেন Monton Gusewitch। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নিজে স্বতন্ত্রভাবে কোন প্রবন্ধ না লিখলেও বুদ্ধদেব বসুর জনপ্রিয় প্রবন্ধ 'আড্ডা' এর ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন । এত ভালো একটি সাহিত্যিক পত্রিকা হলেও 'Contemporary'-র মাত্র দুটি সংখ্যা প্রকাশ পেয়েছিল । কিন্তু তা হলেও 'Contemporary' কোন পর্যায়ের সাহিত্যপত্র ছিল তা বোঝা যায় তার লেখকসূচী এবং বিষয়বস্তুর দিকে তাকালে। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনা প্রকাশ পেয়েছিল এতে । শুধু সাহিত্যই নয় চিত্রকলা, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে যেমন রচনা ছিল তেমনি কবিতার মত সৃষ্টিশীল রচনাও এতে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্থান পেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে 'Contemporary' প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক বিশ্বসাহিত্যকে বাঙালি এবং অবাঙালি পাঠকের কাছে তুলে ধরা । মোটকথা একটি সফল সাহিত্যপত্রের সকল গুণই 'Contemporary'-র মধ্যে ছিল । আর 'Contemporary' প্রকাশই পেত না যদি না সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের বড় মামা সিরাজুল ইসলাম এতে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সিরাজুল ইসলামের স্ত্রী অর্থাৎ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র বড় মামী রাহাত-আরা বেগম ছিলেন একজন উর্দু লেখিকা । বেশ কয়েকটি উর্দু উপন্যাস তিনি রচনা করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নিশীথে' গল্প এবং 'ডাকঘর' নাটকটি উর্দুতে অনুবাদ করেন । সাহিত্য ও রবীন্দ্র সংস্কৃতি পরিস্নাত মামাবাড়ির পরিবেশ  সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্কে প্রাণিত করেছিল সন্দেহ নেই । এপর্বে 'ঢাকা ইন্টার মিডিয়েট কলেজ অ্যানুয়াল'-এ প্রকাশিত তাঁর গল্প 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'-র রবীন্দ্র প্রতিধ্বনি সংবলিত শিরোনাম সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের মানসের সে পরিচয়কেই উৎকীর্ণ করেছে । এপ্রসঙ্গে আরো একজনের কথা উল্লেখ করতে হয় । তিনি আর কেউ নন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের ফরাসিনী স্ত্রী অ্যান-মারি লুই রোজিতা মার্সেল্ তিবো । তাঁর সঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের পরিচয় হয় অস্ট্রেলিয়ায়। ১৯৫২ সালে ওয়ালীউল্লাহ্ দিল্লীর পাক হাইকমিশন থেকে অস্ট্রেলিয়ায় বদলি হন । অস্ট্রেলিয়াতে তিনি ছিলেন পাকিস্তান হাই কমিশনের প্রেশ অ্যাতাশে। অপরদিকে অ্যান-মারি ছিলেন ফরাসি দূতাবাসের অফিসার । যেহেতু তিনি ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী তাই তাঁর কাজ ছিল মূলত দোভাষীর । ঘটনাচক্রে পাকিস্তান এবং ফরাসি উভয় দূতাবাসেরই অবস্থান ছিল সিডনীর পিট স্ট্রিটে পরস্পর মুখোমুখিভাবে । অ্যান-মারির সঙ্গে

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র পরিচয় হয় এক অস্ট্রেলিয়ান স্থপতির দেওয়া বড়দিনের পার্টিতে । তাঁদের যখন পরিচয় হয় তখন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র বয়স ৩১ বছর আর অ্যান-মারির মাত্র ২৩ বছর । দিল্লির পর ওয়ালীউল্লাহ্‌র এটি ছিল দ্বিতীয় কর্মস্থল অ্যান মারির প্রথম (দেশের বাইরে)। উভয়ের এই পরিচয় আর একটু নিবিড় হয় একমাস পরে আর একটি পার্টিতে । নিজের বাসায় দেওয়া ওয়ালীউল্লাহ্‌র সেই পার্টিতে অ্যান-মারিও নিমন্ত্রিত ছিলেন । তিনি পার্টিতে ওয়ালীউল্লাহ্‌কে বিয়ারের বোতল খোলার কাজে সাহায্য করেছিলেন । এই পরিচয় ধীরে ধীরে প্রণয়ে পরিণত হতে থাকে । কিন্তু ঠিক তখনই ওয়ালীউল্লাহ্‌কে ২৯৫৪ সালের ১৪ই অক্টোবর ঢাকায় বদলি করা হয় তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে । ঢাকায় কিছুদিন অবস্থান করার পরেই তাঁকে পুনরায় বদলি করা হয় । এবার কর্মস্থল পাকিস্তানের শহর করাচি । অ্যান-মারি থেকে যান অস্ট্রেলিয়াতেই । এত কিছুর পরেও তাঁদের দেড়-দু বছরের সখ্য ও ঘনিষ্ঠতা রূপান্তরিত হয় পরিণয়বন্ধনে । ফলে তাঁরা বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। ওয়ালীউল্লাহ্‌ তখন কর্মসূত্রে পাকিস্তানে থাকায় অ্যান-মারিও তাঁর সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ১৯৫৫ সালে করাচিতে চলে আসেন । অ্যান-মারি এবং ওয়ালীউল্লাহ্‌ দুজনের কেউই কোন ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না । কিন্তু তার পরেও ১৯৫৫ সালের ৫ই অক্টোবর করাচীর ৮ নম্বর ভিক্টোরিয়া রোডে ইসলাম-ধর্মমতে তাঁরা বিয়ে করেন । অ্যান-মারি লুই রোসিতা মার্সেল তিবো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর মুসলমান নাম রাখা হয় আজিজা মোসাম্মত নাসরিন । বিয়ের কাবিন নামায় দেনমোহর ধার্য হয় পাঁচ হাজার টাকা । নবলব্ধ এই নামকে বিয়ের কাবিন নামাতেই নির্বাসন দিয়েছিলেন দুজনে । কাবিন নামা ছাড়া আর কোন দিন অ্যান-মারি তাঁর মুসলমানি নাম ব্যবহার করেননি । অনুমান করা চলে সর্বতোভাবে আধুনিক দুই মানুষের প্রাচীন ও অসংস্কৃত একটি প্রথার কাছে নতিস্বীকারে কোন আনন্দ ছিল না; প্রেমের মূল্য ধর্মান্তরীকরণে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা । এ অধ্যায়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর প্রসঙ্গ আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে । অ্যান-মারির পরিচিতি যদি শুধুমাত্র একজন খ্যাতিমান লেখকের পত্নীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত তবে তাঁর সম্পর্কে কিছু না লিখলেও বাংলা সাহিত্যের এমন কিছু ক্ষতি হত না । কিন্তু তিনি শুধু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র পত্নীই নন তার থেকেও বেশি কিছু । কারণ তিনি ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্য সফরের এক গুরুত্বপূর্ণ সহযাত্রী। ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যিক মানস গঠনে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে অ্যান-মারির গুরুত্ব অপরিসীম । অ্যান-মারি ছিলেন একজন উচ্চশিক্ষিতা ফরাসিনী মহিলা । তিনি ছিলেন

যুক্তরাষ্ট্রের ফুলব্রাইট স্কলার । আর ফরাসিদের রুচিশীলতার কথাতো সর্বজনবিদিত। তাঁর এ শিক্ষা এবং রুচিশীলতা যে ওয়ালীউল্লাহ্‌কে আকর্ষণ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই । তাঁরা উভয়েই ছিলেন সাহিত্যানুরাগী আর তাঁদের পড়াশোনার পরিধিও ছিল খুবই বিস্তৃত । তলস্তয়, গোর্কি, পুশকিন, দস্তভয়েস্কি, মার্কস, এঙ্গেলস্, টয়েনবি, কাসিরের, কাফকা, লোরকো, ভলতেয়ার, রুশো, দিদেরো, সার্ত্রে, কামু, মালরো, স্যাঁত এক্সপুরি, পল এলুয়ার, এজরা পাউন্ড, টি এস এলিয়ট, স্যামুয়েল বেকেট, ফ্রাৎন্স কাফকা, ভার্জিনিয়া উলফ, ইভলিন ভাউ, ডিলান টমাস, ডি এইচ লরেন্স, এল ডুরেল, অ্যাংগাস উইলসন, অ্যালবির নাটক, জেমস জয়েস, গ্রাহাম গ্রিন, প্রেসকট, সিজার পাভিস, আলবের্তো মোরাভিয়া, মিগেল দে, উনামুনো, টমাস মান, হেরমান হেস, গুন্টার গ্রাস, লেভি স্পাউস, আইজাক ডয়েটসার, পাবলো নেরুদা প্রমুখ আধুনিক সাহিত্যের সকল ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, কবি এবং নাট্যকারদের প্রতি তাঁদের আগ্রহ ছিল সমভাবে বর্তমান । অ্যান-মারি আমাদেরকে জানিয়েছেন--

*''আমরা দুজন একই বই পড়তাম, তারপর সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতাম কিংবা বইগুলো নিয়ে পরস্পরের কাছে মন্তব্য লিখতাম । ১৯৫৪-১৯৫৫ সালে সে যখন ঢাকায় ও করাচিতে এবং আমি প্রথমে সিডনিতে ও পরে গ্রেনোবলে তখন আমরা এ কাজই করেছি : (এর স্বপক্ষে তিনি তাঁদের একটি পত্রের কিছু অংশ তুলে ধরেছেন)*

*'কাল আমি হান্স রুয়েশের অন টপ অব দ্য ওয়ার্ল্ড বইটি শেষ করলাম । বইটি মেরু অঞ্চলের এস্কিমোদের নিয়ে । খুবই হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস, খুব সুন্দরভাবে লেখা । এর মানুষগুলো ভালোবাসার উপযোগী, সরল, সুখী ও হাসিখুসি । আমি নিশ্চিত, বইটি তোমার ভালো লাগবে । দেখি তুমি বইটি খুঁজে পাও কিনা । (তুমি বইটি পাবে পকেট বুক সিরিজে) তুমি কি দয়া করে পল এলুয়ার, ডিলান, টমাস, পাবলো নেরুদা, পল ভালেরি, রোনাল্ড ফারব্যাঙ্ক, অঁরি মিশো, জাঁ ককতো এবং জেরার দ্য নেরভালের ওপর নিউ ডিরেকশনস বুক, রুটলেজ, আর কেগান পল লিমিটেডের বই জোগার করতে পারবে (যদি তোমার অসুবিধা না হয়)? অন্তত এদের কয়েকটি বই ওখানে পাওয়া যেতে পারে । তোমাকে আরনল্ড হসারের দ্য সোশ্যাল হিস্ট্রি অব আর্ট নামে একটি বইয়ের খোঁজ করতে বলেছিলাম। বইটি দুই খন্ডের । আমি স্যাঁত এক্সুপেরির উইন্ড স্যান্ড অ্যান্ড স্টারস বইটি পড়ে শেষ করলাম। শেষ অধ্যায়টি ছাড়া বইটি আমার ভীষণ ভীষণ ভালো লেগেছে । আমার মনে হয় ,তিনি এমন এক মহান*

*লেখক, যিনি রুটিনে বাঁধা জীবনের হাত থেকে রেহাই পেতে ওড়ার পথ বেছে নিয়েছিলেন । [১২ বছর বয়সে ওয়ালী পাইলট হতে চেয়েছিলেন।]*

*আমার সেই পাগল, সুবন্ধুটি চট্টগ্রাম ফেরার পথে আমাকে ফ্রেঞ্চ থটস ইন দ্য এইটটিনথ সেঞ্চুরি বইটি পাঠিয়েছে । বইটিতে রুশো (রঁমা রোঁলার লেখা) ভলতের (অঁদ্রে মরোয়ার লেখা) এবং দিদেরোর (এদুয়ার হেরিয়র লেখা) স্থান দেওয়া হয়েছে । আমি শুধু দিদেরোর অধ্যায়টি পড়তে চাই; তাকে নিয়ে খুব বেশি আমি জানি না' ।'"*[৯]

অ্যান-মারি আরো জানিয়েছেন তাঁরা দুজনেই দার্শনিক আলোচনা পছন্দ করতেন । আর তাই তাঁরা এমন ব্যক্তির সঙ্গেই মিশতেন যারা তাঁদের মতই এ-জাতীয় আলোচনা করতে পারতেন বা ভালোবাসতেন । তাঁদের বন্ধুমহলের প্রায় সকলেই ছিলেন বুদ্ধিজীবী । তাঁরা দুজনই মনে করতেন, মানুষের ভেতর স্বভাবসুলভ মঙ্গলচিন্তা কাজ করে । নৃতত্ত্ব বিষয়ে তাঁরা নতুন নতুন বই পড়তেন । একটা কোন বই, বা দুজনে দেখেছে এমন কোন চলচ্চিত্র, কিংবা যাদের সঙ্গে তাঁরা মেলামেশা করছে, কিংবা কোনো বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, অথবা কোনো রাজনৈতিক ঘটনা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁরা পরস্পর মত বিনিময় করতেন । এছাড়া অস্ট্রেলিয়া থাকাকালীন তাঁরা বুদ্ধিজীবী বন্ধুরা মিলে একটা চক্র তৈরি করেছিলেন । এই চক্রের সদস্যরা একে অপরের সঙ্গে বই লেনদেন করতেন, নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতেন। সর্বসাম্প্রতিক বইটি কে আনতে পারে এ নিয়ে চক্রটির মধ্যে এক প্রকার প্রতিযোগিতা ছিল। এ চক্রের সকলেই একে অপরের দেশকে জানার ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে একটা তাগিদ অনুভব করতেন। অস্ট্রেলিয়া থাকাকালীনই রিচার্ড রাইট, হাওয়ার্ড ফাস্ট, ফকনার, স্টেইনব্যাক, আরস্কিন কল্ডোয়েল প্রমুখ লেখকের বইয়ের পাশাপাশি বহু অস্ট্রেলীয় এবং অন্যান্য লেখকের বই তাঁরা পড়েছেন । এভাবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এবং অ্যান-মারি ওয়ালীউল্লাহ্ কর্মসূত্রে যেখানেই গেছেন সেখানেই তাঁরা নতুন নতুন চিন্তাশীল বন্ধু তৈরি করে নিয়েছিলেন । আর তাঁদের পাঠাভ্যাসও বজায় ছিল । অ্যান-মারী জানিয়েছেন--

*''ইন্দোনেশিয়া থেকে যখন আমরা চলে আসি, তখন শুধু আটটি কাঠের বাক্সবোঝাই বই বয়ে আনতে হয়েছে আমাদের । এ সবগুলো বই-ই আমরা জাকার্তায় কিনেছি । প্যারিসে নতুন বই কিনতে প্রতি সপ্তাহে ও দূতাবাসের কাছে শঁজেলিজের ড্রাগ স্টোরে যেত ।*

*ও আমাকে 'বাবুরনামা' পড়িয়েছে । ওর কাছে আল বেরুনির 'ভারত' বইটির একটি চমৎকার সংস্করণ ছিল । তা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে ওর কাছে ছিল প্রচুর বই ।''*[১০]

এর থেকে একথা স্পষ্ট যে ওয়ালীউল্লাহ্‌র সর্বক্ষণের সাহিত্যসঙ্গী ছিলেন অ্যান-মারি ওয়ালীউল্লাহ্‌। ওয়ালীউল্লাহ্‌ এবং অ্যান-মারি যেন একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ । তাঁদের চিন্তা-ভাবনার এই আদান-প্রদানই হয়ত সাহিত্যিক ওয়ালীউল্লাহ্‌র এক মূল চালিকা শক্তি । অ্যান-মারী যেমন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন তেমনি ওয়ালীউল্লাহ্‌র বিভিন্ন লেখা সম্পর্কেও তিনি মতামত দিতেন। আর তাঁর মতামতকে ওয়ালীউল্লাহ্‌ যে যথেষ্ঠ গুরুত্ব দিতেন তাও আমরা জানতে পারি ওয়ালীউল্লাহ্‌র চিঠি থেকে । আমরা জানি ওয়ালীউল্লাহ্‌র লেখার মূল লক্ষ্য ছিল পূর্ব বাংলার গ্রামের মানুষের জীবন-যাত্রা । অথচ তিনি থাকতেন বিদেশে । একারণে পূর্ব বাংলার গ্রামীণ মানুষের জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘকাল কোন যোগাযোগ ছিল না । তাই এ বিষয়ে অ্যান-মারি সন্দেহ প্রকাশ করলে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ জানান --

*''আমার বইপত্র আর লেখালেখির ব্যাপারে তুমি খুব প্রাসঙ্গিক একটি প্রশ্ন তুলেছ, তা হলো, আমি যে গ্রাম আর মানুষজন নিয়ে লিখি, গোর্কি ওদের যতটা কাছ থেকে জানতেন, অতটা জানাশোনা কি তাদের নিয়ে আমার আছে? জানি না, তুমি এটা মনে করো কি না যে ওদের নিয়ে লিখতে গেলে ওদের মধ্যে আমাকে বসবাস করতে হবে । আমার পক্ষে সেটা করা সম্ভব নয় । গ্রামের লোকদের নিয়ে লিখতে গেলে আমাকে কেন গ্রামের মানুষ হতেই হবে? এটা অত্যাবশকীয় নয় । অন্যদিকে, গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো কী শুধু সেটাই আমি জানি না, সেই সঙ্গে তাদের গঠন, তাদের ইতিহাস, তাদের সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ে আমি ওয়াকিবহাল । আমি তাদের গোটা জীবন বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে পারি, আর সেটা পারি আমি গ্রামের মানুষ নই এবং আমি গ্রামে থাকি না বলে । ওদের মধ্যে বসবাস করলেও গুটিকয়েক গ্রামবাসির জীবনের আক্ষরিক এবং ফটোগ্রাফিক বিবরণ তুলে ধরা আমার লক্ষ্য হতো না । বরং আমি যাদের চিন্তাম, তারা যে এক বৃহৎ সামাজিক-অর্থনেতিক বুনোটের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ সেটা বোঝানোই আমার লক্ষ্য ।''*[১১]

অ্যান-মারি শুধুমাত্র সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্য সফরের এক সহযাত্রী হিসেবে ছিলেন না, তিনি নিজেও একজন সাহিত্যিক ছিলেন । শ্রীমতি অ্যান-মারি সৈয়দ

ওয়ালীউল্লাহের ‘লালসালু’ গ্রন্থটি ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন । গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে । প্রথম অবস্থায় গ্রন্থটির তিন হাজার কপি প্রকাশিত হয়েছিল যা দু’ বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যায় ।‘লালসালুর’ এই ফরাসি অনুবাদের বিশেষত্ব এই যে এটি শুধুমাত্র পূর্ববাংলারই নয় তৎকালীন পাকিস্তানেরও কোন কথাশিল্পীর প্যারিস থেকে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস । এজন্য একটি ঐতিহাসিক দ্বায়িত্ব পালনের কৃতিত্ব রয়েছে অ্যান-মারির ।‘লালসালু’ ছাড়াও ‘চাঁদের অমাবস্যা’ উপন্যাসেরও ফরাসি অনুবাদ করেছিলেন তিনি ,যার নাম ফরাসি ভাষায় ‘লা-ল্যুন-নোয়া’- অর্থাৎ ‘কালো চাঁদ’ ।‘লালসালু’ এবং ‘চাঁদের অমাবস্যা’ উপন্যাস দুটি ছাড়াও তিনি ‘কেরায়া’ গল্পটির ফরাসি অনুবাদ করেছিলেন ইংরেজি অনুবাদ Cargo থেকে । গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল প্যারিসের নামকরা পত্রিকা Esprit-এ । আবার 'Tree Without Roots' নামে ১৯৬৭ সালে ‘লালসালু’-র যে ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল লন্ডন থেকে সেই গ্রন্থের চার অনুবাদক-কায়শার সয়ীদ, অ্যান-মারি তিবো, জেফ্রি গিবিন এবং মালিক খৈয়ামের মধ্যে অ্যান-মারি ছিলেন দ্বিতীয় জন। এছাড়া 'The Black Moon' নামে ‘চাঁদের অমাবস্যার’-ও তিনি ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন । যদিও তা অপ্রকাশিতই থেকে গেছে । এ আলোচনা থেকেই স্পষ্ট অ্যান-মারির পরিচিতি শুধুমাত্র একজন খ্যাতিমান লেখকের পত্নীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । তিনি তাঁর থেকেও অধিক কিছু ।

আত্মীয় পরিজনদের পাশাপাশি এক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের বন্ধুদের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন । কারণ বরাবরের স্বল্পভাষী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের বন্ধু সংখ্যা সব সময়েই কম ছিল । তিনি তাঁর অন্তর্মুখী স্বভাব ও রুচিশীলতার কারণে নির্বিচারে সকলের সঙ্গে মিশতে পারতেন না । শুধুমাত্র তাঁদের সঙ্গেই মিশতেন যাদের সঙ্গে তাঁর মানসিকতার মিল হত । শৈশবে পিতার চাকরি এবং পরবর্তী জীবনে নিজের পড়াশোনা ও কর্ম ক্ষেত্রের প্রয়োজনে বারবার বদলি হওয়ার কারণে তাঁর বন্ধু সংখ্যা কখনই অধিক হতে পারে নি । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের বিমাতার কাছ থেকে জানা যায় তাঁর পিতা সৈয়দ আহমদউল্লাহ ১৯৩২-৩৪ সাল পর্যন্ত যখন মানিকগঞ্জের মহকুমা প্রশাসক ছিলেন তখন মানিকগঞ্জের কোতোয়ালি থানার পুলিশ অফিসার আজমুল্লাহ চৌধুরীর ছোট ছেলে বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব তৈরি হয় । বুলবুল চৌধুরী যার ভালো নাম রশীদ আহমেদ চৌধুরী, তিনি মানিকগঞ্জ হাই স্কুলে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের অগ্রজ নসুরুল্লাহর সঙ্গে একই শ্রেণিতে পড়লেও পরবর্তীতে অনুজ ওয়ালীউল্লাহের সঙ্গেই তাঁর অধিক হৃদ্যতার সৃষ্টি হয় । ওয়ালীউল্লাহের বিমাতা জানান ওঁরা

সব সময় এক সঙ্গে থাকতেন। 'সমাজের জন্য কিছু একটা করা দরকার'-এরকম একটা ভাবনা তাঁদের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই ছিল । অন্যান্য ছেলেদের মত খেলাধূলায় তাঁদের বেশি আগ্রহ ছিল না ।তার পরিবর্তে তাঁরা শিল্প ও সাহিত্য নিয়েই মেতে থাকতেন । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের মতই বুলবুল চৌধুরীও ছিলেন যথেষ্ঠ প্রতিভাবান । ১৯৩৪-এ মানিকগঞ্জে এক স্থানীয় চিত্র-প্রদর্শনী হয় । তাতে বুলবুল চৌধুরী ও ওয়ালীউল্লাহের দুটি চিত্র পুরস্কৃত হয় । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এবং বুলবুল চৌধুরী দুজনেরই চিত্রকলা এবং সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক থাকলেও পরবর্তী জীবনে বুলবুল চৌধুরী বাংলাদেশে বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর নৃত্যকলার জন্য। শৈশবেই কোনো রকম প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই বুলবুল চৌধুরী সম্পূর্ণ নিজের প্রচেষ্টায় নৃত্যশিল্পকে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি নৃত্য পরিবেশন করতেন । তবে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা তিনি না পেলেও মানিকগঞ্জের এক শিক্ষিত বনেদী হিন্দু পরিবার তাঁর এই শিল্পচর্চায় কিছুটা সাহায্য করেছিল । ওই পরিবারের দুজন সদস্য তখন বোলপুরের শান্তিনিকেতনে নৃত্যশিল্পের শিক্ষার্থী ছিলেন । তাঁরা যখন ছুটিতে বাড়ি আসতেন তখন বুলবুল চৌধুরী তাঁদের কাছ থেকে নৃত্যশিল্পের ব্যাকরণ জেনে নিতেন । এভাবেই ধীরে ধীরে একলব্যের মতো কঠোর অধ্যাবসায় দ্বারা বুলবুল চৌধুরী হয়ে ওঠেন পূর্ব বাংলার এক প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী। তবে অসামান্য প্রতিভাবান বুলবুল চৌধুরী নৃত্যশিল্পী না হলে একজন কথাশিল্পী হতে পারতেন । তাঁর উপন্যাস 'প্রাচী',নৃত্যনাট্য 'মহাবুভূক্ষা','পাছে ভুলে যাই', 'জেলে' ছোটগল্প 'হাফিজের স্বপ্ন', 'আনারকলি', 'চাঁদ-সুলতানা' প্রভৃতি উচ্চপ্রশংসিত হয়েছিল । ওয়ালীউল্লাহের জীবনে বুলবুল চৌধুরীর অবদান অপরিসীম । কারণ খুব সম্ভবত বুলবুল চৌধুরীর প্রভাবেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ লেখালেখির দিকে ঝোঁকেন । তার পূর্বে লেখালেখির থেকে ওয়ালীউল্লাহের চিত্রশিল্পের দিকেই অধিক মনোযোগ ছিল । ওয়ালীউল্লাহের বিমাতা জানিয়েছেন খুব ছোট বয়স থেকেই তাঁর ছবি আঁকার শখ ছিল । রং-তুলি কাগজ ছাড়া শিশু ওয়ালীর আর কোন চাহিদা ছিল না । চিত্রশিল্পের প্রতি এই অনুরাগের কথা তাঁর বন্ধুদের সকলেরই জানা ছিল । তাঁর এক স্কুল সহপাঠীর ভাষায়--

*''বস্তুতঃ বাল্যকাল থেকেই সে চিত্রশিল্পে উৎসাহী । ফেনী স্কুলে তাঁর সম্পাদিত হাতের লেখা ম্যাগাজিন 'ভোরের আলো'কে ওয়ালীউল্লাহকে সব অন্তর দিয়ে সাজিয়ে তুলতে অঙ্গসজ্জা, লেখার পরিচ্ছন্নতা সব কিছুতে তাঁর সূক্ষ্ম শিল্পী-মনের স্বাভাবিক প্রকাশ। মনে পড়ে ওয়ালীউল্লাহ্ এঁকে এঁকে স্কুলের রাফ বই ভ'রে তুলতো । বাড়িতে যখনই যেতাম একটা*

*না একটা ছবি এঁকে এনে তুলে ধরতো আমার সামনে । .....আমার মনে হয় অত অল্প বয়সে ওয়ালীউল্লাহ্ সাহিত্যিক হিসেবে নাম না কিনে ফেললে হয়তো-বা ওয়ালীউল্লাহ্র ব্যক্তিত্বে একটি অনন্য চিত্রশিল্পীর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতো ।''*[১২]

ওয়ালীউল্লাহ্ নিজেও তাঁর এই ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন । তাই নিজেও দ্বিধান্বিত ছিলেন লেখা না আঁকা কোন মাধ্যমকে তিনি অধিক গুরুত্ব দেবেন । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র এ দ্বিধা সম্পর্কে অ্যান-মারীও অবগত ছিলেন । তিনি জানিয়েছেন--

*''বেশ কিছুদিন সে বলেছে ,ও লেখক না শিল্পী হতে চায়-বয়সে তরুণ বলে এ সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না । ওর কাজিন আমাকে বলেছিল,১৪-১৫ বছর বয়সে ও খুব আঁকাআঁকি করত । ওদের সঙ্গে থাকতেন সৎখালা । তিনি আমাকে বলেছেন, একদিন ও পড়া না করে ছবি আঁকছিল । ওর বাবা এসে চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে উঠিয়ে ওর আঁকা ছবি ছিঁড়ে ফেলেছিল। ওয়ালী তখন নিচু স্বরে বলেছিল,'ছবি আঁকা চালিয়ে যেতে হলে আমাকে মাথার চুল ছেঁটে ফেলতে হবে ।''*[১৩]

প্রকৃতার্থে গল্প এবং কবিতার মত তরুণ বয়সে ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর আঁকা ছবিও নানা পত্রপত্রিকায় পাঠাতেন । কলকাতার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর পাঠানো সেই সব ছবির কিছু প্রকাশিতও হয়েছে । তাঁর আঁকার হাত যে মন্দ নয় এ তথ্য তারই প্রমাণ দেয় । প্যারিসে থাকাকালীন তিনি প্রচুর ছবি এঁকে ছিলেন । সেই সব ছবি নিয়ে ওয়ালীউল্লাহ্র একটি চিত্র প্রদর্শনী করার ইচ্ছা ছিল । যদিও তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে নি । দেয়ালে কোন কুৎসিত চিত্রকর্ম তাঁর পছন্দ হত না । তাই যখন যে বাড়িতেই থাকুন না কেন সে বাড়ির দেয়াল থেকে অপছন্দের চিত্র সরিয়ে তাঁর আঁকা কোন ক্যানভাস তিনি দেয়ালে বসিয়ে দিতেন । অ্যান-মারির কাছ থেকে আমরা জানতে পারি ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় থাকাকালীন ওয়ালীউল্লাহ্র শখ ছিল প্রতিকৃতি আঁকা । সেই সময় তিনি তখনকার রাষ্ট্রদূতের এবং অ্যান মারির প্রতিকৃতিও এঁকেছিলেন । যার মধ্যে চারটি বিমূর্ত চিত্র অ্যান মারি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও সযত্নে আগলে রেখেছিলেন । এছাড়া ওয়ালীউল্লাহ্র ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কারো কারো কাছে ওয়ালীর বেশ কিছু ছবি রয়েছে । শখের চিত্রকর্ম ছাড়াও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর নিজের কয়েকটি গ্রন্থেরও প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন । 'লালসালু' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ 'Tree Without Roots' এর প্রচ্ছদ তাঁর নিজেরই আঁকা । 'লালসালু' ছাড়াও 'চাঁদের অমাবস্যা','কাঁদো নদী কাঁদো' এবং 'দুই তীর'-এর প্রচ্ছদও তিনি নিজে করেছেন ।

এবিষয়ে আমরা নির্ভরযোগ্য তথ্য পাই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রকাশক মোহাম্মদ নাসির আলীর বক্তব্য থেকে । তিনি জানিয়েছেন --

*''সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ সাহেবের দ্বিতীয় উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' ছাপা হচ্ছে । প্রেসে ছাপার কাজ যখন প্রায় অর্ধেক শেষ হয়েছে, এমন সময় আমার মনে পড়লো প্রচ্ছদপট আঁকার কথা । তিনি তখন রয়েছেন সুদূর প্যারিস শহরে । আমি তাঁকে চিঠি লিখে জানতে চাইলাম, প্রচ্ছদপট কী রকম হবে, কাকে আঁকতে দেবো, ক্ষুদ্রাকারে প্রচ্ছদপটের কোন খসড়া প্রতিলিপি অনুমোদনের জন্য প্যারিসে তাঁর কাছে পাঠাব কি না ইত্যাদি । জবাবে যা লিখে পাঠালেন তাতে আমি বরং খুশীই হলাম । তিনি লিখলেন, এক সময়ে আমি নিজেই ছবি-টবি আঁকার চেষ্টা করতাম, বেশ ঝোঁক ছিলো সেদিকে । এখন সব ছেড়ে দিয়েছি । কে কি বলবে জানি না, তবু যদি বলেন তো আমি নিজেই প্রচ্ছদের জন্য একটা কিছু এঁকে পাঠাতে পারি । ওখানকার বন্ধুদের দেখালে যদি সবাই পছন্দ করেন, তবে ছাপাবেন, নয়তো ভালো কোন শিল্পীর সাহায্য নেবেন ।*

*তিনি নিজের লেখা বই এর প্রচ্ছদ নিজে আঁকতে চেয়েছেন, এটাকে আমি মণিকাঞ্চন সংযোগ মনে করলাম ।.....বলা বাহুল্য, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ সাহেবের 'চাঁদের অমাবস্যা' বইএর যে প্রচ্ছদপট আপনারা দেখেছেন,তা সেই অনুরোধেরই ফল । সযত্নে প্যারিস থেকে প্রেরিত প্রচ্ছদপট দিন পনেরর মধ্যেই ঢাকায় এসে পৌঁছলো । বিশেষ করে দেখালাম তাঁর অন্যতম বিশিষ্ট বন্ধু কবি সানাউল হক সাহেবকে । এই বইখানার পান্ডুলিপি তিনিই প্যারিস থেকে ব'য়ে এনে আমাকে দিয়েছিলেন । গ্রন্থকারের অনুপস্থিতিতে তিনিই বন্ধুর পক্ষে আমাদের সঙ্গে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেছিলেন ।.....*

*'দুই তীর'-এর পেছনে ক্ষুদ্র একটি ইতিহাস আছে .....বই ছাপা শুরুর আগেই এবার আমি প্রচ্ছদ এঁকে পাঠাবার কথা বলে রাখলাম । প্রচ্ছদপট অঙ্কনের হাত থেকে তিনি যে নিস্তার পাবেন না, এবিষয়ে বুদ্ধিমান গ্রন্থকার সম্ভবতঃ সচেতনই ছিলেন । চিঠি পাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি 'কভার' এসে পৌঁছলো । অধীর আগ্রহে আমি পার্সেলের মোড়ক খুলতে লাগলাম । মোড়ক খুলেই একটু ধাঁধাঁয় পড়লাম বই এর নামকরণ দেখে । তিনি তাঁর এ গল্প সংকলনের নাম রেখেছেন 'স্তন' । আমাদের দেশে প্রকাশিত একখানা বাংলা বইয়ের নাম 'স্তন' রাখা কতটা সংগত হবে, সমালোচকেরা কি বলবেন, অনুক্ষণ এ ভাবনা আমার মনে । ঠিক এ সময়ের দু'একদিন পরেই ভাগ্যক্রমে বাংলা একাডেমীতে দেখা পেলাম কবি সানাউল হক*

*সাহেবের । গ্রন্থকারের অপর এক বন্ধু তো সেখানে ছিলেনই । কথাটা পাড়তেই বুঝতে পারলাম চিঠিপত্রের মাধ্যমে বই-এর নামকরণের ব্যাপারে তাঁরা উভয়েই আগে থেকে জানতেন। তাঁরা উভয়েই আমাকে সমর্থন করলেন । হেসে বললেন, ওঁকে আমাদের নাম করে চিঠি লিখে দিন, বই এর সম্ভাব্য ক্রেতা বাঙালী মহিলা হ'লে তো কথাই নাই, পুরুষ হ'লেও দোকানে এসে এ-নাম ধ'রে একখানা বই চাইতে লজ্জাবোধ করবে, এ কথাও লিখে দিন।..... চিঠি লিখলাম সুফলও পেলাম । বইএর নাম পাল্টে করা হলো, দুই তীর । প্রচ্ছদের ব্যাপারেও আমার একটু ভাবনা ছিলো, হয়তো তিনি শুধু নামই নয়-প্রচ্ছদের আমূল পরিবর্তনের কথা তুলবেন । কারণ প্রচ্ছদটি পুরোপুরি abstract ধরণের । পূর্ব নামের সঙ্গে এর কোনো অসংগতি আছে কিনা আমার তা জানা ছিলো না, দেখলাম তা নেই । নেই বলেই তিনি শুধু নামটা কোনো শিল্পীর সাহায্যে পরিবর্তন করিয়ে তাঁর আগের প্রচ্ছদটাই ছাপাতে অনুমতি দিয়েছেন ।*

*আমাদের প্রকাশিত মরহুম সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহেবের তৃতীয় পুস্তক 'কাঁদো নদী কাঁদো', বলা বাহুল্য, এ পুস্তকখানার প্রচ্ছদ অঙ্কনের কাজ থেকে লেখককে নিস্তার পেতে দিইনি ।''*[১৪]

শুধুমাত্র নিজের বই-ই নয় কখনো কখনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের বইয়ের প্রচ্ছদও তিনি এঁকে দিয়েছেন । চিত্রশিল্পের প্রতি এই ভালোবাসার কারণেই ওয়ালীউল্লাহ্ পৃথিবীর যে প্রান্তেই গিয়েছেন, সেখানকার চিত্রশালাগুলো ঘুরে দেখেছেন ।১৯৫১ সালে তিনি যখন নয়াদিল্লিতে পাকিস্তান দূতাবাসের তৃতীয় সেক্রেটারির পদমর্যাদায় প্রেস আতাশের কাজ করছিলেন তখন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এবং অ্যান-মারি একাধিকবার অজন্তা ইলোরায় গেছেন প্রাচীন মানুষের শিল্পকর্ম দেখতে । ছয় ও সাতের দশকে করা বুদ্ধদেবের 'Fresco' দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন । এই গুহাচিত্রের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ থেকেই প্যারিসে গিয়ে তিনি যান দক্ষিণ ফ্রান্সের ল্যাকো-- 'Lascaus'-তে প্রাগৈতিহাসিক শিল্পকর্ম দেখতে । সেখানকার গুহাচিত্রে পশু শিকারের দৃশ্যের ছবি, ষাঁড়, ঘোড়া, লাল হরিণ প্রভৃতির এবং তীরবিদ্ধ গর্ভবতী পশুর ছবি দেখে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন । প্যারিসের সবকটি চিত্রশালা এবং জাদুঘর তাঁরা দেখেছেন। এছাড়া ফ্লোরেন্স, রোম, হল্যান্ডের বেশ কিছু জাদুঘর এবং স্পেনের এল প্রাদো জাদুঘরেও তাঁরা গেছেন । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ইমপ্রেশনিস্ট আর আধুনিক চিত্রকরদের ভক্ত ছিলেন । ভারতীয় চিত্রকরদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যামিনী রায় এবং নন্দলাল বসু তাঁর প্রিয় চিত্রকর ছিলেন। তিনি যখন কলকাতায় ছিলেন তখন খুব কাছ থেকে এঁদেরকে দেখার সুযোগ

পেয়েছিলেন । পাকিস্তানি চিত্রশিল্পীদের মধ্যে রশীদ চৌধুরী, সাদেকাইন, নভেরা আহমেদ--এদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল । এরা পরামর্শের জন্য প্রায়ই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে ফোন করতেন । যে কোন পাকিস্তানি শিল্পী প্যারিসে আসলে ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁর সাধ্যমত তাঁদেরকে সাহায্য করতেন । বাংলাদেরশের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদীন ছিলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে একজন । শুধু তাই নয় জয়নুল আবেদীনের চিত্র থেকে উৎসাহিত হয়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌ বেশ কয়েকটি ছোটগল্প রচনা করেছিলেন । যেমন জয়নুল আবেদীনের একটি বিখ্যাত চিত্র ছিল 'নাইওর' । চিত্রটি কলকাতা থেকে সাপ্তাহিক 'মিল্লাত' পত্রিকায় আরো কয়েকটি চিত্রের সঙ্গে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল । চিত্রটিতে দেখা যায় গরুর গাড়িতে করে বউ বাপের বাড়িতে নাইওর যাচ্ছে । গাড়ির পেছনে বসে বউ পর্দা তুলে বাপের বাড়ি যাবার পথ-ঘাট দেখছে । গাড়ির ঠিক পাশেই বগলে ছাতা আর মাথায় টুপি পরে এক মুরুব্বি সাথে সাথে চলেছে । গ্রাম্য নেড়ে কুকুরও লেজ নেড়ে চলেছে তাদের পেছনে পেছনে । আর চিত্রটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তুটি হল গাড়ির ছইয়ে বাঁধা এক ছড়া কলা। ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'নানির বাড়ির কেল্লা' গল্পেও আমরা হুবহু এই দৃশ্য দেখতে পাই যখন ফনু শহর থেকে পালিয়ে তার নানির বাড়ি যাওয়ার জন্য খেয়াঘাটে এসে পৌছায় । খেয়াঘাটে সে পৌছায় ঠিকই কিন্তু পারানির ভাড়া না থাকায় সে নদী পার হতে পারে না । বহু নৌকায় সে অনুরোধ করে তাকে পার করে দিতে কিন্তু কেউ তাকে বিনা পয়সায় পার করে দেয় না । অপেক্ষা করতে করতে দুপুর হয়ে যায় । বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালাও । বাধ্য হয়ে ফনু শেষ পর্যন্ত নদীর জল পান করে । নদীর জল পান করে সে যখন কিছুটা ধাতস্থ হয় ঠিক সেই সময়ে নাইওর-যাত্রী কিশোরী বউ কুলসুমের ডুলি ঘাটে এসে পৌছায়--

*''ডুলির পাশে প্রৌঢ় মজিদ । হাতে এক কাঁড়ি কলা,একটা জলজলে কাতলা মাছ আর বগলে বিবর্ণ ক্যানভাসের জুতোজোড়া । ডুলির পেছনে নিরিহ চেহারার একটা কুকুরও ছিল। (এক ক্রোশ আগে পঞ্চবটি গাছের তলা থেকে পিছু নিয়েছে কুকুরটা । কেন কে জানে। হয়তো মাছের লোভে বা ক্যানভাসের জুতোজোড়াটির লোভে । কিন্তু তার চেহারা দেখে সে-কথা বুঝবার উপায় নেই । সারাপথ জিভ বের করে ধুঁকতে ধুঁকতে এসেছে । পর্দার ফাঁক দিয়ে কুলসুমের সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে ক-বার । দেখে কুলসুম ভেবেছে, বেশ হয়েছে । তার শ্বশুরবাড়ি থেকে যাচ্ছে দু-জন লোক ।একজন মজিদ, আর ঐ কুকুর ।) ফনু যে-কারণে*

আকৃষ্ট হয় এ-ক্ষুদ্র নাইওর-যাত্রী দলটির প্রতি, তার প্রধান কারণ হয়তো মর্তমান কলার কাঁড়িটা । মাছটা দেখে কেবল তারিফ করে । আরাঁধা মাছ দেখে তার জিব দিয়ে-তো লালা পড়তে পারে না । আড়চোখে ফনু কুকুরটার পানে তাকায় । উত্তরে একবার সে অকারণে লেজটা নাড়ে ।

খেয়া তখন ওপারে । ডুলির কাছে মাছটা ও মর্তমান কলার কাড়িঁটা নাবিয়ে রেখে মজিদ ঘাটের দোকানে যায় বিড়ি কিনতে, আর বাহকরা অদূরে গাছের ছায়ায় বসে কাঁধের গামছা দিয়ে গায়ে হাওয়া করে । ক্ষেত্র পরিষ্কার দেখে কুলসুম কচ্ছপের সন্তর্পণতায় পর্দা ফাঁক করে। সামনেই দাঁড়িয়ে তখন ফনু । কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে কুলসুম । তারপর হঠাৎ অন্তরে তার মায়ার ঝড় জাগে । ইশারা করে কাছে ডাকে ফনুকে । ফনুর স্বভাবগত সন্দিগ্ধ মন একটুতেই সজাগ হয়ে ওঠে, কিন্তু এখন ফনু আর সে-ফনু নেই । কতক্ষণ তবু ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থেকে সে লকলকিয়ে এগিয়ে আসে । বলে,

-- কী কও ?

কী বলবে ভেবে না পেয়েই হয়তো কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে । তারপর হঠাৎ বলে,

-- কেলা খাবি ?

কেলা খাওয়া নানারকম হতে পারে । তাই সাবধানী ফনু টক করে জবাব দেয় না । দুজনে কেবল চোখাচোখি করে ।অবশেষে ফনুর চোখ ছলছল করে ওঠে । দ্বিরুক্তি না করে সরাসরি মাথা নেড়ে জানায়, খাবে ।

কাঁড়িটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে কুলসুম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় ফনুর পানে, তারপর কাত করে তার থেকে একটা কলা ছেঁড়ে । লাল-নীল কাচের চুড়িভরা পাতলা হাতটি ফনুর দিকে ক্ষিপ্রভাবে বাড়িয়ে দিয়েই গলায় কেমন উত্তেজনা বোধ করে । কাঁপা গলায় বলে,

-- খা ।

কলা নিয়ে ফনু একবার মুখ বিকৃত করে । কাঁচা শক্ত কলা ।কলিমুদ্দি ভুইঞা এমন কলা খায় না । তারপর মুখ আরো বিকৃত করে খোসা ছাড়িয়ে মুখে দেয় সেটা । পাশে কুকুরটা তখন পায়ে ভর দিয়ে বসে জিবটা ঝুলিয়ে হাঁপাচ্ছে-চোখে এমন একটা ভাব যে বুঝবার উপায় নেই এ-দৃশ্যে সে মোটেই আকৃষ্ট কি না ।কুলসুম তার পানে চেয়ে একবার জিব বের করে ভেংচি কাটে।কুকুরটা নির্লিপ্তভাবেই সহ্য করে অপমানটা । ঝুলন্ত জিহ্বা টেনে নিয়ে মুখে সঞ্চিত লালা গিলে আবার হাঁপাতে থাকে ।

*ফনু হঠাৎ হাসে । যেন এক যুগ পরে হাসে । তারপর হঠাৎ সচেতন হয়ে কুলসুমের পানে কেমন দৃষ্টিতে তাকায় । বলে,*

*-- খাইছি কেলা ।*

*কুলসুম গম্ভীর হয়ে ওঠে । হঠাৎ কঠিনভাবে বলে,*

*--বাস্, আর পাইবি না ।*

*ফনু ক্ষুণ্ন হয় । বলে,*

*--আমি কি আর চাইছি, চাইছি ?*

*একটু পরে ফনু অন্য একটি জিনিস চায় । বলে,*

*--আমারে চাইরডা পয়সা দেও-নদী পারামু । থেমে কঠিন গলায় বলে,-না দিলে নদীৎ ঝাঁপ দিমু ।*

*পয়সা বস্তুটা কুলসুমের কাছে স্বর্ণলঙ্কারের চেয়ে কম মূল্যবান নয় । তার কারণ প্রথমটা দেখে না, এবং দ্বিতীয়টি দেখলেও এত কম দেখে যে, না দেখারই মতো । বর্তমানে তার লাল শাড়ির খসখসে আঁচলে ছ-টি আনা বাঁধা ছিল । কিন্তু সেইটে বের করে তার কিছু ভাগ কাউকে দেয়া সহজ কথা নয় ।*

*কতক্ষণ চুপ থেকে থেকে হঠাৎ একটা উৎসাহে কুলসুমের মুখ জ্বলজ্বল করে ওঠে । ক্ষিপ্র গলায় বলে,*

*--আয়, এই ভিত্রে আইয়া বয় । কেও দেখব না । যে-ডুলিতে চড়ে কুলসুম নাইওর যাচ্ছে সেটা এমন বড় কিছু যান নয় । বাঁশের ফ্রেমে তাঁবুর মতো কৌণিক অতি সংকীর্ণ একটা ব্যাপার । পর্দার ফাঁক দিয়ে গলা বাড়িয়ে ফনু ভেতরটা একবার দেখে কোনোপ্রকার উৎসাহ বোধ করে না ।*

*তার নিরুৎসাহ ভাব দেখে কুলসুম হঠাৎ ভয়ানক তাড়া দিয়ে বলে ,*

*--আয়, জলদি আয়, ওরা আবার আইয়া পড়ব নি ।*

*মুখ যুগপৎ কালো ও তেড়া করে ফনু জবাব দেয়,-তার চাইয়া আমারে পয়সা দেও ।আমি কি মাইনষের বউ যে ডুলিৎ চইরা যামু ?*

*কয়েক মুহূর্ত কুলসুম বোঝে না কী করবে । পয়সা দেয়া যায় না, কিন্তু কী করে তাকে পার করে ? আরেকবার সে বিচিত্র কর্তৃত্বের কণ্ঠে ধমকে বলে,*

*--আয় ছ্যামড়া, আইয়া বয় ভিতরে ।*

*ফনু অনড় । এমন একটা ভাব যে, নদীর ওপারে না যেয়ে মরতে হলেও সে ডুলিতে চড়বে না ।*

*এমন সময় গাছের তলা থেকে ষন্ডামার্কা বাহক দুটি উঠে দাঁড়ায় । বোঝা গেল মজিদ আসছে এদিকে, খেয়া-নৌকাও এ-পারে এসে পৌঁছেছে নিশ্চয় । ঝট করে ডুলির পর্দা সরে গেল ।*

*যাবার আগে একটা ছোটখাটো কান্ড হল ।কলার কাঁড়ির পানে তাকিয়ে মজিদ চেঁচিয়ে ওঠে,*

*--কেলা খাইছে কে?*

*বাহক কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় ভেতর থেকে কিশোরী বউ কলসুম ক্যাঁ-ক্যাঁ করে উঠল । মজিদ পর্দার কাছে মুখ নিতেই সে আবার বলে,*

*--আমিতেই খাইছি । ভুখ লাগছিল । তাই খাইছি ।*

*কথাটা মজিদের বিশ্বাস হয় না । এধার-ওধার তাকায় সন্দিগ্ধভাবে । ফনু তখন অনেক দূরে। কুকুরটা কেবল পাশে বসে আছে । তার ওপর মজিদের চোখ পড়তেই সে একবার লেজটা নেড়ে দেয় ।*

*পথঘাট দেখে চুপ হয়ে যায় মজিদ । কিন্তু রাগে গরগর করতে থাকে ভেতরটা ।*

*নৌকা তখন মাঝ-নদীতে । অতি সন্তর্পণে পর্দাটা ঈষৎ সরিয়ে ফেলে-আসা তীরের পানে সে তাকায়। ফাঁকা তীরে প্রথমেই নজর পড়ে কুকুরটার পানে । তীরে বসে কেমন তাকিয়ে আছে খেয়া-নৌকাটির দিকে । জিব বের করে তখনো তেমনি হাঁপাচ্ছে । দেখে কুলসুমের বুকে দীর্ঘশ্বাসের ঝড়ো হাওয়া জাগে । ভাবে, আহা বেচারা ! মানুষ হলে হয়তো বুক ভাসিয়ে কাঁদত ।*

*সত্যিকার মানুষ ফনু তখন গুম হয়ে আছে । নির্মল আকাশে কড়া উজ্জ্বল রোদ । কিন্তু এত আলো তার চোখে অন্ধকার হয়ে ওঠে এবং সে-অন্ধকারে জীবনে প্রথম একটি কথা বোঝে । বোঝে, নানির বাড়ির কেল্লাটা একটি আস্ত ভুয়ো কথা । আসল জীবনের নির্মমতা থেকে ওখানে পালিয়ে বাঁচা যায় না ।*

*অদূরে খেয়ার মালিক সামনে পয়সাভর্তি হাতবাক্স নিয়ে স্থূল দেহটা শিথিল করে একটু চোখ বোজে । নাকে আওয়াজ হয়, ভুঁড়ি ধীরে-ধীরে ওঠে-নাবে । তার একটু সামনেই একটি ছেলের জীবনে নতুন এক অধ্যায়ের যে সূত্রপাত সে-খবর পায় না ।''*[১৫]

স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্যের নিয়মে গল্পে বহু ঘটনা এবং চরিত্রের আমদানি করা হয়েছে । গল্পের প্রয়োজনে ফনু চরিত্রের আমদানি করা হয়েছে । কুলসুমের প্রশ্রয়ে ফনুর নদী

পার হওয়ার বিচিত্র ঘটনার কথা বলা হয়েছে । এত কিছু সত্ত্বেও কিন্তু পাঠক জয়নুল আবেদিনের চিত্রের নির্যাসটুকু এই ছোটগল্পেও অনুভব করতে পারেন । 'নানির বাড়ির কেল্লা'গল্পটি ছাড়াও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'নয়নচারা' গল্পগ্রন্থের দুর্ভিক্ষ বিষয়ক গল্প 'নয়নচারা' এবং 'মৃত্যুযাত্রা'গল্পদুটিও খুব সম্ভবত জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষের চিত্র দ্বারা প্রভাবিত । শুধু ছবি আঁকাই নয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ পছন্দ করতেন চিত্র সমালোচনা করতেও। একসময় তিনি স্বনামে এবং ছদ্মনামে নানা পত্রপত্রিকায় চিত্রসমালোচনা করতেন । কলকাতার চিত্রশিল্পের প্রদর্শনীগুলোর উপর বিভিন্ন ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকায় তিনি সমালোচনা লিখতেন । করাচির Dawn পত্রিকায় তাঁর যে সব চিত্র-সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- Zubeyda Aga:Pioneer of Abstract Art in Pakistan, Sadekin: The Young Artist, Joynul Abedin: A Victim of Conflicting Ideas প্রভৃতি । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সমালোচনার প্রতিবাদে 'কোয়ার্টারলি পাকিস্তান'-এর সম্পাদক এস.আমজাদ আলী আবার লিখলেন এক প্রতিবাদী প্রবন্ধ-'জয়নুল আবেদিন: এ ভিকটিম অব কনফিউজড্‌ ক্রিটিসিজম' । এর প্রত্যুত্তরে ওয়ালীউল্লাহ্‌ লেখেন 'জয়নুল আবেদিন:এ ভিকটিম অব ফ্রাংক ক্রিটিসিজম' । যদিও তাঁর এ প্রবন্ধটি কোথাও প্রকাশ হয়েছিল কিনা সে ব্যাপারে অ্যান মারি নিশ্চিত করে কিছু জানাতে পারেননি । তবে সেই সময়ের প্রখ্যাত ইংরেজি দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় তাঁর একাধিক চিত্র প্রকাশিত হয়েছিল ।'অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস এক্‌জিবিশন'সম্পর্কে মোহাম্মদী পত্রিকায় ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত লেখাটিতে তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার কিছুটা স্বাক্ষর রয়েছে । তাঁর সমালোচনার ভাষাও স্বচিহ্নিত । যেমন--

*''এ্যাকাডমী অব ফাইন আর্টস-এর যে নবম প্রদর্শনী হয়ে গেল, সে-প্রদর্শনী বহুদিন পর হলো বলে তার জন্যে একটা অদম্য কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু সে-কৌতূহল ব্যর্থ হয়েছে চরমভাবে । ব্যর্থ হয়েছে ভালো ছবির অভাবে, বাংলার শিল্পীদের চিত্রাধিক্যে, আগে প্রদর্শিত ছবির পুনঃপ্রদর্শনের জন্যে । প্রদর্শনীতে ঢুকেই প্রথমে নজরে পড়ে হেমেন মজুমদারের চিত্র, হয়তো নূতনের থেকে পরিচিতের আকর্ষণ বেশি বলে । আশৈশব মজুমদারের যে-চিত্রগুলো দেখছি, মনের অবচেতনা-পরিচালিত দৃষ্টি সে-চিত্রের পানে আপনা থেকেই যায় । কিন্তু তাঁর যে-চিত্রগুলো ছোটোবেলায় দেখে ভেবেছি, হয়তো সে-চিত্রের নারীরা তাঁর যৌবনকালের, কিন্তু আমরা যৌবনপ্রাপ্ত হয়েও এখনো সে-নারীদের ঠিক তেমনি ঢঙে তেমনি ভঙ্গিতে দেখলে চমক লাগে । অন্ততপক্ষে একপুরুষ আগের আমাদের নানিতুল্য নারীদের*

*অসংবৃত-বসন ও সিক্ত-বসনের তলে সুডৌল উরু আর বিলোল কটাক্ষ আমাদের সংকুচিত ও আহত করে । কিন্তু এটা কৌতুক হলো । তাঁর সাকি, বাংলার সুন্দরী, সূর্যমুখী (সূর্যমুখীর চেয়ে নারীদেহ নামই বেশি সার্থক হতো)-এমন আরো অনেক ছবি চোখে ও মনে সত্যিই অসহ্য ঠেকে । এসেব ছবি প্রদর্শনীতে না-পাঠিয়ে নারীদেহলোভাতুর মারবারদেশীয় লোক অথবা স্থূলবুদ্ধি জমিদারের গৃহে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেই উত্তম হবে, ওরাও পুলকিত হবে, আমরাও রেহাই পাবো, শিল্পীর পকেটও ভারি হবে। .....*

*রমেন চক্রবর্তীর নাকি বিভিন্ন ধরনের ছবি আঁকবার আশ্চর্য ক্ষমতা । স্বীকার করি । কোনো আর্টস ইস্কুলের অধ্যক্ষ হতে হলে সে-রকম ক্ষমতা থাকা বাঞ্ছনীয়-একথাও স্বীকার করি । এ-প্রদর্শনীতে বরফাচ্ছন্ন শীতের প্যারী (২৩৮), সাদা হিমালয়ের মধ্যে বদ্রীনাথ (২৩২), প্যানেল, পোট্রেট-- ইত্যাদি সবরকম রয়েছে। তবে তাঁর পোট্রেট-ত্রিপুরার মহারাজা-সেটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য । এটি দেখবার সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপকের সঙ্গে আমার আলোচনা হচ্ছিলো । তিনি বললেন: মহারাজার হাতে আলবোলা কেন ? বললাম: সেটা শিল্পীর দোষ নয় । মহারাজা হয়তো অমন আলগোছে আলবোলার নল হাতে ধরে শাহি ভাব বজায় রেখেছেন । বললেন : মুখটা অমন লাল কেন ? বললাম : সেটা সম্ভবত শিল্পীর দোষ। মহারাজার মুখে হয়তো শাহিরক্তের আধিক্য দেখিয়েছেন । কিন্তু আর সর্বত্র রঙের মিশ্রণে শিল্পী যে অদ্ভুত সংযত ক্ষমতা ও সূক্ষ্ম রুচিসম্পন্ন মনের পরিচয় দিয়েছেন,তার মধ্যে ওই লালের দৌর্বল্য ও বাচালতা চোখে ঠেকে । (অতুল বোসের 'লেডি মুখার্জি' আগাগোড়া বাচালতা ।) তাছাড়া অঙ্কনের দৌর্বল্যও চোখে ঠেকে । তবু, তাঁর এ-বৃহৎ পোট্রেটটিতে বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচয় মেলে । .....*

*যামিনী রায়ের বাপ ও মেয়ে ও গান্ধী চিত্র দুটি বিগত যামিনী রায়কে স্মরণ করিয়ে দেয় । ওঁর গান্ধীটি বেদনার নিবিড়তায় ঘন, আর একটা বৃহত্তর আদর্শের সংযত অথচ অনমনীয় বিকাশ তাতে চমৎকারভাবে ফুটেছে । এক কথায় :সে-ছবির পানে চেয়ে গান্ধীর কর্মজীবন যেন পাঠ করা যায় ।*

*সফিউদ্দীন আহমদের সভাপতির স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত পারাবত তৈলচিত্রটি তার ঘরোয়া আন্তরিকতা অথচ তার ওপরও কেমন একটা ম্লান দূরত্ব মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে । তাঁর যে কয়টি স্থিরচিত্র আছে তার প্রত্যেকটি পাকা হাতের ও সূক্ষ্ম সংযত দৃষ্টির পরিচায়ক । তাছাড়া যে-কয়টি নিসর্গ দৃশ্য রয়েছে,তার প্রায় প্রত্যেকটিতে পাকা হাতের ছাপ। গোটা দৃশ্য*

*আত্মগত করে নিয়ে বিশিষ্ট ভঙ্গিতে প্রকাশ করেন তিনি, অথচ সে-প্রকাশ অতি আস্তে হয় বলে আর বিবরণ বর্জিত বলে তা চোখে না ঠেকে অন্তরে গিয়ে পৌঁছে । আনোয়ারুল হকের হিজলা হতে ময়ূরাক্ষী তৈলচিত্রটি উল্লেখযোগ্য । ময়ূরাক্ষীর বাঁকের সাথে মন যেন উড়ে যায় । ডান-বামে বাজে ছবি দেখতে-দেখতে ক্লান্ত চোখে কানোয়ালের চিত্রগুলো নতুন উদ্দীপনা দেয়। তাঁর চিতোর দুর্গ, তিব্বতের মৃতবাহক, উদয়পুর বাজার এবং বিশেষ করে খড় সংগ্রহকারী চিত্র একাধারে রঙের ভাববিন্যাস, অংকন, বিষয় ও বাস্তবতার জন্যে উচ্চস্থান দাবি করতে পারে। জলচিত্রে প্রথমস্থান অধিকার করা পল রাজের যাত্রা ছবিটি সত্যিই প্রথম স্থান অধিকার করবার উপযুক্ত কিনা, এ সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ করেছেন, কিন্তু যাত্রার যা আসল কথা : বলদের গাড়ি আর বাঁকের এ-ধারে সামান্য পথটুকু কেন্দ্র করে যে-কথা শিল্পী বলতে চেয়েছেন তা নিখুঁতভাবে ফুটেছে বলে সে-সন্দেহ অমূলক । আর কিছুতে চোখ নড়বার কথা নয়, যাত্রার পথে অনেক কিছু দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়, দৃষ্টিগোচর হলেও তেমন স্পষ্টভাবে হয় না । এখানে বলদটানা গাড়িটি যে চলেছে তার ঝাঁকুনিও যেন অনুভূত হয়, বলদের গলায় ঘন্টিও যেন শোনা যায় । এটাই যাত্রা চিত্রটির চমৎকারিত্ব ।''*[১৬]

ছবি আঁকার নেশা ছাড়াও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের আরো একটি ব্যতিক্রমি এবং দুর্লভ নেশা ছিল । স্থাপত্য শিল্পের প্রতি ভালোবাসা-আগ্রহ থেকেই হয়তো তাঁর মধ্যে বিভিন্ন শৈল্পিক আসবাব নির্মাণের শখ তৈরি হয়েছিল । তিনি খুব ভালো কাঠখোদাই এবং ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ জানতেন । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের এই ব্যতিক্রমী এবং দুর্লভ গুণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে অ্যান-মারি বলেছেন--

*''সে আধুনিক স্থাপত্য ও আসবাব পছন্দ করত । ১৯৫৫ সালে করাচিতে থাকতে ও বাঁশের কয়েকটি আসবাব তৈরি করেছিল । জাকার্তায় আমরা যে বাসাটি ভাড়া নিয়েছিলাম সেটিতে কোনো আসবাবপত্র ছিল না । ওকে সব আসবাব বানিয়ে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল ।*

*'কিছু বেতের চেয়ার ডিজাইন করব ভাবছি । এখানকার মানুষ খুব সুন্দর সুন্দর বেতের চেয়ার বানায় । আমার মনে হয় ভালো ডিজাইন পেলে একঘেয়ে ডিজাইন থেকে মুক্তি পেতে ওদের ভালোই লাগবে । পরীক্ষামূলকভাবে আমি একটি ডিজাইন বানিয়ে নেব (কল্পনা কর আমি আসবাবপত্রের ডিজাইন করছি ।)''*[১৭]

আসলে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিলেন গভীরভাবে নান্দনিক। অযন্ত-অবহেলায় সাজানো কোন কিছুই তাঁর পছন্দ হত না । কোন ভাড়া বাড়িতে থাকলে তিনি নিজের রুচিমত আসবাব ও সজ্জা দিয়ে সেই বাড়িকে সাজিয়ে তুলতেন । সেই ঘরের দেয়াল থেকে অপছন্দের চিত্রকর্ম সরিয়ে নিজের আঁকা কোন চিত্র বসিয়ে দিতেন । কখনো বা একটি আধুনিক নক্শার আরামকেদারা, একটা নিচু টেবিল অথবা কোন গালিচা । এমনকি ফুলদানি কিনেও তাতে কারুকার্য করতেন । মাঝেমধ্যে আবার তিনি অ্যান-মারির পোশাকেরও কাপড় বেছে দিতেন, ডিজাইন করে দিতেন । বাড়িতে কোন অতিথি এলে একজন আদর্শ গৃহকর্তার মত টেবিল সাজাতেন, ঝকমকে টেবিল ক্লথ কিনে আনতেন । এ সব ছাড়াও কিনে আনতেন অপ্রচলিত শৌখিন অলংকার । নিজের বইয়ের প্রচ্ছদ যেমন তিনি নিজে আঁকতেন তেমনি নিজের শিল্পকর্মও তিনি নিজেই বাঁধাই করতেন । যার জীবনের পুরোটাই ছিল নান্দনিক তিনি যে অপরের জীবনকেও নান্দনিকতায় ভরে দিতে চাইবেন সেটাই তো স্বাভাবিক। আর তাই তিনি আমাদের দেশের সাধারণ বাঁশের তৈরী বাড়িগুলোকেও বিশেষভাবে বানাতে চাইতেন--

*''আমার মাথায় একটা নতুন আইডিয়া এসেছে । কিন্তু সেটা বাস্তবে রূপ দিতে পারব বলে মনে হচ্ছে না । যদি পারতাম ভালো লাগত ।*

*বাংলার গ্রামাঞ্চলে ওরা বাঁশ দিয়ে বাড়ি বানায় । দেশে বাঁশের অভাব নেই । তাছাড়া এটি সহজে বাঁকানো যায় এবং টেকসই উপাদান । আমার মনে হয় এই উপাদানটি দিয়ে আমি খুবই শৈল্পিক একটি বাড়ি ডিজাইন করতে পারব ।এতে খরচও বেশি পড়বে না । আমার মতে, বাংলার শৈল্পিক মোটিফ, চিরাচরিত ফুল ও গাছপালা প্রভৃতি ব্যবহার করে এবং পূর্ণ চালা তৈরির নতুন নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করে এমন কিছু তৈরি করা সম্ভব, যা একই সঙ্গে হবে একেবারে প্রথাবিরোধী ও বৈপ্লবিক । গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিন ধরে বাঁশের বাড়িঘর ব্যবহার করতে হচ্ছে (দক্ষিণ আমেরিকার কিছু অংশের লোকদের যেমনটা করতে হয় ) : সে ক্ষেত্রে নতুন আইডিয়া প্রয়োগ করে তারা একই উপাদান দিয়ে শিল্পসম্মত বাড়িঘর তৈরি করবে না কেন? যেমন ধরা যাক, জাপানে ওরা মাত্র কয়েক ডলার খরচ করে বাড়ি বানিয়ে ফেলে; তার পরেও ওদের বাড়ির ভেতরটা কত শৈল্পিক । এ থেকে আমার মনে হয়েছে, যে-কেউ অনেক কিছু করতে পারে এবং যদি করার ইচ্ছে থাকে তাহলে তার সামনে প্রচুর সুযোগ আছে।''*[১৮]

স্থাপত্য বিদ্যার প্রতি এই ভালোলাগা থেকেই তিনি একদিন আবিষ্কার করে ফেলেন বাংলা টাইপ রাইটার । আমরা অনেকেই জানিনা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বাংলা-টাইপ-রাইটারের কী বোর্ডের প্রথম উদ্ভাবক । ১৯৬০ সালের প্রথম দিকে তিনি সর্বপ্রথম এ বিষয়ে উদ্যোগ নেন। সে উদ্দেশ্যে লন্ডন ও জার্মানির টাইপ-রাইটার নির্মাতা কোম্পানিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করেন । বাংলা কী-বোর্ড সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি পরামর্শ করেছেন শওকত ওসমান, মুনীর চৌধুরী, মুহাম্মদ আব্দুল হাই প্রমুখের সঙ্গে । মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে সরাসরি এবং ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের পরিচালক এ. জেড খানের মাধ্যমেও তিনি কী-বোর্ড সংক্রান্ত কাগজপত্র আদান-প্রদান করেছেন । প্যারিস থেকে তিনি তাঁদের কাছে জানতে চেয়েছেন, দেশে আর কেউ এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছেন কিনা । তিনি বাংলা টাইপ রাইটার আবিষ্কার করে তাতে যে লেখা-লেখি শুরু করেছেন তা আমরা জানতে পারি ১২ই এপ্রিল ১৯৬৩ ঢাকা থেকে শওকত ওসমানকে ওয়ালীউল্লাহের নতুন বাংলা টাইপ-রাইটারে লেখা একটি চিঠি থেকে--

*''আশা করি, তোমার কারখানায় কিছু নতুন মাল [সাহিত্যকর্ম] তৈরি হচ্ছে । যথা সময়ে খবর পাওয়া যাবে । এই মাল তৈরির একটা সহজ পরিশ্রম-লাঘব উপায় তোমাকে বাৎলে দেওয়া হচ্ছে । অচিরে একটা পোর্টেবল বাংলা টাইপরাইটার বানিয়ে নাও । আমি এক মহাশয়ের কল্যাণে বানিয়ে এনেছি । ২রা জানুয়ারি ১৯৬৩ মেশিন হাতে এসেছে । তুমি ইউরোপে আছো, তোমার পক্ষে আরো সহজ । আর নিজের মত বানিয়ে নিতে পারবে । এটা রেমিংটনের ব্যন্ড ১১ ইলেভেন বলে আগে থেকে অর্ডার দিতে হয় । তবে পাওয়া যায়। চল্লিশ পাউন্ড দাম । পোর্টেবলে কিছু অসুবিধা আছে । সব যুক্ত অক্ষর 'কী-বোর্ডে' দেওয়া যায় না । তবু আমাদের জন্য এই ভালো । ওরা যে চামড়ার কেস খানা দেয়, তা সত্যি সুন্দর । বয়ে নিয়ে যাওয়া অতি সহজ ।*

*তুমি হয়ত ভয় পাবে : কলমে লেখা অভ্যেস, মেশিনে চিন্তা ঠিক দৌড়বে তো ? আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, দুমাস পরেই আমি সোজা মেশিনে কম্পোজ করি, এ পর্যন্ত পাঁচটা গল্প, গোটা দুই প্রবন্ধ লিখেছি । ভাষা ইত্যাদি সব রপ্ত হয়ে গেছে । আমার স্পীড, যদিও যুক্ত অক্ষরের জন্যে ব্যাক-স্পেস দিতে হয়, পনর থেকে বিশ । একজন লেখকের তার চেয়ে বেশি লাগে না । আর কপি করার হাংগামা ত জানো । তা থেকে বাঁচা যায় । দুই কপি সঙ্গে সঙ্গে হয় । এ কি কম সুবিধে ? পাশে বেশী করে মার্জিন রাখি, পরে সংশোধন করে নিই বা যদি কিছু বদলানোর থাকে বদলাই । আমার ত অপরের মুখে ঝাল*

*খাওয়া । এই মেশিনে অনেক ইমপ্রুভমেন্ট এর সুযোগ আছে । যেমন-এরা শ্রী দিয়ে রেখেছে। শ্রী ভারতে বেশি ব্যবহার হয় । আর ওটা যখন বানিয়ে নেওয়া যায়, তার জায়গায় যুক্ত অক্ষরের বরং একটা সুবিধে করে দিতে পারে । আমি কোম্পানীকে শিগগীর পত্র লিখব । তুমি নিজে লন্ডন গেলে সব ঠিক করে নিতে পারবে । এই মেশিনে ব্যাটারা 'খন্ডত' দেয় নি। কি যে মুশকিল। আমি ব্যাকেট আর ফুটকি দিয়ে কাজ চালাই । কাছে থাকলে এসব হত না।''*[১৯]

পরবর্তীকালে আর্থিক দুর্দশায় পরে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর এই শখের টাইপ রাইটারটি বিক্রি করে দেন । যা আর কখনো কিনতে পারেন নি ।

আলোচনা হচ্ছিল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের জীবনে তাঁর বন্ধুদের ভূমিকা নিয়ে । আমি পূর্বেই বলেছি মানিকগঞ্জ থাকাকালীন ওয়ালীউল্লাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গে, যার প্রভাব তাঁর জীবনে অপরিসীম । ১৯৩২-১৯৩৪ সাল পর্যন্ত মানিকগঞ্জ হাই স্কুলে পড়ার পর পিতার বদলির কারণে তাঁদেরকে চলে যেতে হয় অন্য জেলায় । স্বাভাবিকভাবেই ওয়ালীউল্লাহ্কে তাঁর বিদ্যালয়ও পরিবর্তন করতে হয় । আমরা একবার দেখে নেব ওয়ালীউল্লাহ্ কোথায় কোথায় পড়াশোনা করেছেন--

১৯৩২-১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ = মানিকগঞ্জ হাই স্কুল ।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ = ফেনী হাই স্কুল ।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ =কুড়িগ্রাম হাই স্কুল । (প্রবেশিকা পরীক্ষা)

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ =ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ । (আই. এ.)

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ =ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ । (বি.এ.)

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ =কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ।

এছাড়াও মাঝে কিছুদিন তিনি চট্টগ্রাম জেলা স্কুল এবং কৃষ্ণনগর কলেজে পড়াশোনা করেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যখন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পড়াশুনা করতেন তখন যাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে তাঁরা হলেন সৈয়দ নুরুদ্দিন, মোহাম্মদ তোয়াহা, সানাউল হক, মির্জা নূরুল হুদা, বাসুদেব বসাক প্রমুখ । লক্ষ্য করার বিষয় এঁরা সকলেই পরবর্তী জীবনে নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন । সৈয়দ নুরুদ্দিন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী এবং পরে গভর্নর হয়েছিলেন অল্প সময়ের জন্য । বাসুদেব বসাকের ঢাকায় বিশেষ খ্যাতি ছিল ভালো ছাত্র হিসেবে । মোহাম্মদ তোয়াহা ছিলেন বাংলাদেশ

সাম্যবাদী দলের প্রধান । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছিলেন তখন তাঁর পিতা সৈয়দ আহমদউল্লাহ্ ময়মনসিংহের এ.ডি.এম থাকা কালে পরিপাক যন্ত্রের আলসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান । পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে শুধু ওয়ালীউল্লাহের পড়াশোনাই নয় তাঁদের পারিবারিক জীবনও অনেকটা বাঁধাগ্রস্ত হয়। ওয়ালীউল্লাহ্ অনেকটা বাধ্য হয়েই ১৯৪৫ সালে প্রখ্যাত ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা স্টেট্সম্যান-এ সাব-এডিটর হিসেবে যোগদান করেন । সেসময়ে স্টেট্সম্যান পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মি. ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং অন্যতম সহকারী সম্পাদক কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। স্বাভাবিকভাবেই ওয়ালীউল্লাহের ইংরেজি ভাষাজ্ঞান খুব ভালো না হলে এরকম এক গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকায় প্রবেশাধিকার পেতেন না । তবুও একজন কর্তব্যনিষ্ঠ সাংবাদিক ও লেখক হিসেবে তিনি নিজের সাহিত্যিক ইংরেজি লেখার দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোড় দেন । ঘড়িতে রীতিমত অ্যালার্ম দিয়ে তিনি খুব ভোরে উঠে উন্নত ইংরেজি শেখা যায় এমন সকল বই পড়তেন সকাল পর্যন্ত। এভাবে কঠোর পরিশ্রম করে তিনি যে চমৎকার সাহিত্যিক এবং বৌদ্ধিক ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন তাঁর নজির আমরা ওয়ালীউল্লাহের ইংরেজি রচনাবলিতে দেখতে পাই। আলোচনার সুবিধার্থে আমি এক্ষেত্রে তাঁর দুই ধরণের রচনা থেকেই উদাহরণ তুলে ধরছি । প্রথম উদাহরণটি দিচ্ছি তাঁর ইংরেজি গল্প Escape থেকে--

""This was the moment of chaotic indecision punctuated with the incredibly real and decisive rattke of the slow moving train over the rusty metre-gauge rails which stretcthed and continuously narrowed behind. The sun rode high mercilessly in the cloudless sky. The tedious journey under its vast expanse of void and heart seemed destinationless. Human odour hung heavy in the crowed compartment; a little, insignificant fly buzzed near the toiled-door; a thin line of dirty water streaked along its threshold .

The yong man felt restless. The vacant mood disturbed him; the jerky movement which seemed undefined and purposeless filled his mind with desolation and despair. Something choked him: the vacant mood engulfed him and he gasped. Immedistely he shook himslf violently and when he sat up straight he heared ripples of acute and powerful moments making queer sounds around him. He heard them; he saw them burst and melt into

nothingness and saw clearly the old man who sat opposite him with a beaked nose and a white, but slightly soiled, embroidered cotton cap. The old man sat motionless and though his nose was visible now and then, his hazy, grey eyes were like big ovel marbels set in two rough, leather pouches, perhaps he was funny to look at or aroused a queer atavistic interest in the mind of an onlooker, and so the young man watched him closely .Presently he found out that he was like a statue seen in a park with inscribed eulogies beneath it which nobody cared to read. He had seen hundreds of them amd seen their white,dirty shoulders. He now imagined that birds would soon be swooping down and sitting on his shoulders where they would chatter and chatter, and then raising their tails, leave dropping on his long thread-bare coat. He shuddred.

But there was a little girl with an innocently grave face sitting almost invisibly reclining against the motionless figure. The young man looked at her and saw the whites of her lustrous big eyes and the innocence. First his nostrails twitched. Innocence had fragrance. Then all of a sound he was all smiles. He smiled expansively and his eyes glittered like glistening water under the blazing noontide sun. He also became a little speculative. Was or was she not feeling miserable, utterly helpless like all these refugees travelling in the inordinately slow moving traon? Perhaps she had lost her mother. Perhaps also her father and brothers and sisters, lost all property also; but that did not evidently concern her. As he smiled this throat became oily.

'You like to hear stories?`

The girl looked a bit startled; she stared at him for a few moments with dull eyes and then turned away her face. There was disappointment in the eyes of the young man and his limbs which had stiffend in anticipation of pleasent intercourses drooped limply. But then he was a courageous man and firmly believed in repeated efforts .He was alo strong, capable of withstanding great hardship and misery. The other refugees had broken down completely .He hed

suffered too but had not broken down. He was only afraid of others. He did not like them breaking down. At this moment he was positively afraid about the girl. He smelled fragrant innocence and trembled inwardly. However, soon he was able to pluck enough courage to look amused.

'Yes, of course, you do not like to hear stories`, he said `I also like to tell stories, for ' he paused and said beautifuliy, ` I am a great story teller. Now hold your patience for a little while and I shall tell you a nice, thrilling story.'

He scratched his chin, scratched the back of his head, screwed up his eyes and then looked out of the window in an apparent effort to recollect the promised story .And as he saw the horizen, hazy and dim i the distance, he lost himself.

Silence reigned.

*What happened then? Crows cawed in that big sprawling rain-tree and drew deep lines on the vacant canvas of silence. Nobody stirred. The stillness was ghastly, ghastly like the oozing of blood. The asphalt melted under the strong, mid-day sun; bright vapours rose stesdily and silently from the stanting corrugated iron sheets which roofed a low house at the corner of the blind alley. Absolutely nothing happened. Only blood, silent and vicious, oozed and oozed....*

Soon the young man began to gasp; cold beads of perspiration stood on his forehead .And then the girl screamed. Swiftly he turned his face towards her and saw her franticaliy tugging at the old man's long coat. His face became pale but it was now alert. Blood returned to his face and he smiled at her timidly. Almost imperceptibly he scratched the tip of his nose and again looked at her. His nose twitched. Innocenced had fragrance. But he was at a loss as to what to do.

Meanwhile babble slowly arose in the compartment. The widemouthed, bulky middle-aged woman who sat in the corner with her short legs on the bench, now began to blow her nose. Her eyes darted here and there as she tried to watch the face of every man who spoke, but tears rolled

down her wheat-coloured sallow cheeks in silence. One of her fingers trembled haltingly. Then the wide-mouthed woman began to wail in an ahrill but forlorn voice. There was something in that voice started the young man who sat up erect with an anxious look in his eyes. It was my mysteriously forlorn and inhuman like the unintelligible wail of the forsaken heart but at the same time piercing like a sharps word.

Oh no, he said and shook his head. His anxious eyes darkened and he looked at the girl and his fears came true. With her head slightly bent she was sharply looking at the wailing woman. All of a sudden he clapped seeking to distract her attention and was again all smiles.

'Hey', he said.

The girl looked at his with frozen eyes. A lock of her dry dusty hair hung over her eyebrows. She looked at the face over which poured a rushing smile, glistening and sweet. But she did not say anything.

'Hey there', he said once again in a highly jovial tone. 'What is your name'?

The girl remained silent though she continued to look at him steadily. When the shrill wailing of the woman's reached a high pitch; her eyes flickered for an instant. One tiny spark of it, But the young man was still afraid. He continued to smile and rather foolishly. He waited and then said.

'All right, don't tell me your name, but tell me - do you like to hear stories? Say, stories about fairies? If you are afraid of the demons in them I can leave them out altogether or make them behave like decent, well-meaning persons .May be they would still look like demons, for if they are so it can't be helped, but they can be made to behave nicely before little persons. I can do that, for 'he added in a boastful tone,' I am a great story-teller.'

Still the girl said nothing .the man smiled and smiled .Only his eyes looked somewhat grave as he watched his own failure .After a painful pause he said hesitatingly:

'May be there should not be any demons at all. Shall I then being the story where there will be no demons?'

She did not say no and he felt emboldened. Being embolded he became restless; his muscles stiffened.

'Well, it is a very interesting story but there are details which I shall have to recollect. Just hold your patience a second.' Then he looked out, unconsciously scratching the back of his head- a habit persistent since his school days, and saw the dim horizon as hazy and as the past itself. Once again he lost himself.

Silence reigned.

*He was not shocked. A crushed, empty pummet lay in the corner and the mouth tasted like verjuice. Everything else was intact. He had not heard the cry; silence reigned heavily. Why does blood not make any sound? The man lay dead there under the deepening oblong shadow and it was true .He did not make any sound. His face was turned towards his slightly lifted left shoulder and it was pale like rice-water. His front tooth which was uneven was visible under his yellowish upper lip. It shone like the dog's tooth-the dog which had been overpowered and drutally killed before it could dig its teeth into somebody else's flesh. The dogs fought here and there. The dogs with stomachs cut open, entwined entrails mixed with blood and dust. It was sickening. He felt like vometing. At that moment he looked up and saw the sky above the house on the upper balcony on which used to stand a slender girl with vacant looks always pressing her flat abdomen against the flower-desined rusty iron-rails. Today she was not there. He did not remember her either. He only saw the sky. Blue, deep, and fathomless, He did not vomit.*

The little girl looked and looked and then she screamed. She frantically tugged at the coat of the old man and said in a frightened whisper.

'Look, he is mad!'

The young man turned his gaze which seemed strange. Cold beads of perspiration once again stood on his forehead and his jaw drooped. He looked

pale and bewildered and vacant like a man just awakened from deep sleep, who was still unable to understand his surroundies. Soon he was blushing without understanding why he should blush. Ha looked at the girl furtively and blushed deeper. He shifted his position. Pretended to scratch his chin and then coughed. He still blushed red and hot.

Suddenly he sat upright, his blush turned into purple anger. Glaring towards the corner he said in a thundering voice.

'Why do you weep, mother? Pray to God, just pray to Almighty God. Besides, we have crossed the boder and there is no fear any more.

His anger vanished abruptly as he turned triumphantly towards the girl. His face was again flooded with a bright shining smile, which was full of kindness. He smiled down at her sniffed loudly. Innocence had fragrance. He seemed to have got it. It smelt sweet, so sweet that it filled the heart of the young man with courage. Of course, he had always been courageous. He never broke down, however cruel the times were.

'I bet you are hungry', he said. 'Well, the train is now entering a station. Perhaps it is a big sation and shall get something to eat there. I will get something for you. Only you will have to tell me your name. People here do not sell anything unless you tell them your name. It is a funny land. I will tell them my name but they will also want to know your name. 'He paused and asked diplomatically, 'What shall I tell them?'

The girl just stared. She did not tell her name. He patienly waited for sometime and then looked mischievously at her and declared:

'Perhaps you have no name.'

Yet the girl did not tell her name. Perhaps she hao vanity which would be piqued.

The train drew in slowly and jerkily. It was a small station but a big crowd of interest travellers stood on the platform. Now they shouted and ran halter-skelter. The young man got down. He was jostled, trampled, pushed this way

and that. Somehow he managed to escape and go to a corner of the low,dust covered platform. The sun beat down; a pungent, nauseating smell of human odour filled the atmosphere .Near the farthest end of the platform there was a tree shading a smal circle, in the midst of which leisurely stood two policemen .One had a gun hanging from his left shoulder; the other had a short, mahagony-coloured baton. The man with the gun had a drooping, walrus moustache which party covered his lips and gave his chin an uncertain look. They were guarding something. It was the partly covered body of a dead man who had wanted to cross the border for safety but now lay there stiff, his skull completely battered.

The young man saw it and in an instant he froze like a statue. Soon he was restored to action by an impulse far stronger than that which had rooted him to the spot. He turned abruptly and ran and towards the train for all he was worth. In the train he sat panting for a long time, his lips parched, and his Adam's apple feequently jerking up and down. He was evidently oblivious of the surrounding, even of the presence of the girl, who in spite of the complete reticence she had so far maintained towards the young man, now looked at him secrectly to find out if he had kept his promise and brought some food for her. She felt hungry and she

Felt like crying .But she didi not cry.

The train moved on. A wind had risen and in the distant fields dust whisled and dashed around, oblitrring the dim horizen. The travellers perspired and groaned. Some dozed.

After the crisis had passed the young man straightened his aching back and began peering around. His eyes were heavy and somewhat dazed. The girl still watched him through the corners of her eyes and as his began to wander she abruptly looked away, blushing vaguely. A strong blast of wind hit her face; the locks of her dry hair swung round and fell over her fliushed cheeks. As he saw her delicate profie and the averted eyes which glistened because they had

grown moist ha felt sad in his heart, a sadness of warmth, affection and clinging desire.

He smiled and clapped and said,' Hey. There!'

The girl said nothing, nor did she turn her averted face. But he waited patiently, and means while more sadness came surging in his mind. At last he said in a sorrowful voice.

'Perhaps you don't like me. Perhaps I remind you of some demon which stealthily came in your dream. 'He suddenly paused and struck his forehead with a finger. What happened to that story? Did not I finish it?''

Where was he?

'You see` he said apologetically, 'a little incident had upset me. At the station I met a friend of mine, a very dear old friend of mine whom I found under arrest. Two heftty, viscious looking policemen were guarding him. But I tell you he is an innocent man. I told the ugly policeman that, but they would not believe me.' He paused and then said in a voice which sounded much hurt. 'You are not looking at me!'

The girl looked at him for a brief, fleeting moment through the soft corners of her eyes and blushed deeply .Yet that short glance cheered him up .His face becamed with pleasure and he looked fairly excited. As a matter of fact, he felt so gratefully happy that his voice choked when he tried to speak. And tears shone in his eyes .At last he composed himself to tell the story.

'Well, where was I?''

Yes where was he? He ransacked his brain which seemed tired and exhausted .What was he saying?

Silence fell .It reigned supreme.

*What was the story he wanted to tell the orld? He had through all he wanted was a raised platform and as he would begin to speak the people would throng the place in their thousands to hear a person who was neither a priphet Mohammed, nor a Jesus Chricst, nor a Gautam Buddha, neither a Voodoo*

*priest, not even a Messiah. A dreadful vision came to his mind in which ha saw millions of dark heads round a pathetic body which dangled in its lifelessness amidst the hell-bound, motionless multitude of erstwhile misguided, helpless humanity. But it was he who wanted to speak, raise a full-throated, blood-curdling cry, through curiously enough; he could not remember his message now. He went out in search of the messeage but saw descarded bits of useless things: a broken leg a battered head, a silent yellowish mouth which no longer foamed in anger and desperation. May be a twisted branch of an up-rooted tree, a dented plummer or a snuggling animel in the desolate woods .The blood was there which oozed and oozed in primordial silence .If the girl had stood there in on the balcony pressing her virgin abdomen against rails and heared the lowing of the lost calf ; if there had been vague twillight of cozy homelines under distant stars .But he did not faint .For he saw the rectangular sky through the jutting corners of various self-asserting houses, pellucid, bright and everlasting .Who discovered that red was complementary to blue ? Of course it did not matter much who he was but one felt this idle curiosity which was imperceptible but strong enough to ignore matters of life and death with equel casualness as a namby-pamby talk or the news of the birth of a child in a neighbours's house .But this curiosity led to red was the colour of the thick liquid which oozed out silently and which would have been serious but for the rectangular position of the vast blue sky .The red ribbon stopped there abruptly*

Once more, yes once more a piercing scream shook the young man violently .It was shattering.Even then he remained still and saw the girl frantically tug at the coat of the old man and heard her say, 'look, he is mad!'

Mad! Who was mad? A mad man right in this compartment? He straightened himself up and blinked in great surprise. 'What, a mad man here? Said the young man maticulously scratched the tip of his nose while looking here and there in search of the mad man .Then he told the girl gravely:

'Look, my dear girl .Whoever he might be will not dare touch a single hair of your head so long as I am here. See the muscles here?'

He showed her his biceps and winked .As he winked in a light mood his reassurance came back to him followed by melting affection and kindness that momentarily grew wild as he saw her shamefacedly trying to hide her face in the threadbare coat of the old man .Waves of affection rose and assailed him; The sweetness and innocence which emerged from the frail dody of the girl mingled with it and intoxicated hin. So much soft tenderness and so much pure joy in this beautiful world of ours, he said with a prayerful solemnity and breathed irregularly .Warm tears again rushed to his shining eyes .What could he not do on yhis earth to protect this softness and tenderness from wind, rain and the fireness of the sun?

After sometime he said in a low voice:

'I really wish I could do something for you, I wish I could at least tell you a nice little story.' He felt miserable as he tried to hide the fact that he was very poor and that he could not give her any present, a doll, sweetmeat, or perhaps a pretty frock .He could not give her anything except a story even which he did not fully remember. 'Well, I heard a story once from my grandmama. Then I was a little kid .This much high .So I do nat remember it exactly .But I may try to recollect it.'

Having said this he began to think in all seriousness as he had a vague feeling that ha had met with faileres on earlier occasions, though he didi not know what their nature was .Life was such, he thought, and laughed inwardly .When you start a story you must know its ending .He laughed inwardly and looked out, feeling amused. The wind had subsided; in the distance villages whirled round as the train and the horizen moved on in parallel lines; the rails underneath whined and groaned .One solitary tree stood alone in the field .

*Then what happened? Palisahed, iridescent life could not be prolonged; it seemed to be on the edge like the slender girl who used to stand pressing her*

*flat abdomen against yhe flower-designed rusty of the balcony .No rollicking fun in all this, for the guillemont had vanished; the dark green foamed-frilled water held no longer its fleeting shadow .Was this the end, the end of the guillemont the dream bird which was fed with pure saline air and ozone ? Was this also the end of the skull and the proud stick which was raised for the sole reason of displaying its horrible shape and ugly whiteness; of the gums of the dyak-hunters and chiselled teeth of the man behind the glass-toped secretariat table and of the lumber submerged deep in the mud? And, last but not least, of the little grave under the pipul tree where no one ever shed tears or burnt candles just because it was the grave of a child?*

This time the young man pratically jumped up in the disgust and anger .This was indeed intolerable .The mad man had no right whatsoever to frighten the little girl who had once again screamed out in fear .Blind with rage, he stood up erect .He must save the girl; he must protect her .Before doing anything he came closer to the girl and whishpered in her ears a word of assurance.

'Don't worry .I will catch the devil by the neck and God above knows what I shall then do to him'

Then like a leopard he jumped foward adn began to search the compartment for the man .He looked here and there; peeped under the wooden benches, craned his neck to see what was behind the pile of trunks; viciously scanned every passenger's face .But he found him nowhere .Then he thought may be he was outside and so, opening the door, steped out of the running train.''[20]

[Pakistan PEN Miscellany, 1950]

ইংরেজি ভাষায় লেখা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র এই গল্পটি বেরিয়েছিল আহমেদ আলী-সম্পাদিত--"Pakistan PEN Miscellany' সংকলনে । করাচির কিতাব পাবলিশার্স ছিল এই বইটির প্রকাশক । প্রকাশকাল: ১০ই আগস্ট ১৯৫০ । পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র ছিল এরকম :

১.Editiorial Note

২.The Writer and his freedom : Sahid Suhrawardy

৩.Three Poems : MumtaZ Shah Nawaz

৪.The Acacia Tree : Sahid Suhrawardy

৫.Before Death : Ahmed Ali

৬.Three Poems : Qazi Nazrul Islam

৭.Some Undercurrents of Urdu Short Story : Qudrattullah Shahab

৮.Poems from China : Ahmed Ali

৯.The Insult : Saadat Hasan Manto

১০. Poems from Yehya Kamal Beyati : Reyazul Hasan

১১. Poems from the Indonesian Poets : Idham and Ahmed Ali

১২. Some Urdu Poets of today : N.M. Rashed

১৩. Loneliness : Faiz Ahmed Faiz

১৪. Poem : Fazle Karim Fazli

১৫. Verses : Majeed Malik

১৬. Escape : Syed Waliullah

এই সংকলনে বাঙালি লেখকদের মধ্যে স্থান পেয়েছিলেন মাত্র দুজন -কাজী নজরুল ইসলাম এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ । নজরুল ইসলামের তিনটি কবিতা ও গানের ইংরেজি তর্জমা করেছিলেন মীজানুর রহমান । গল্প লিখেছিলেন আহমদ আলী, সাদাত হাসান মান্টো এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ । অন্য দুটি গল্পই মূল উর্দু থেকে অনূদিত । উর্দু গল্পকার সাদাত হাসান মান্টো এদেশের পাঠকের কাছে পরিচিত হলেও আহমেদ আলী তত পরিচিত নন । দিল্লির বাসিন্দা আহমেদ আলী ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির । উর্দু এবং ইংরেজি উভয় ভাষাতেই তিনি গল্প এবং উপন্যাস লিখতেন আবার সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘পরিচয়’-গোষ্ঠীতেও তাঁর যাতায়াত ছিল । পেশায় ছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক । গ্রন্থের লেখক সূচী দেখেই আমরা বুঝতে পারছি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের রচনা যদি মান সম্পন্ন না হত তবে কিছুতেই তাঁর লেখা ছোটগল্প এই গ্রন্থে স্থান পেত না । সাহিত্যিক ইংরেজির পর এবার

আমি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র বৌদ্ধিক ইংরেজি ভাষার উদাহরণ তুলে ধরব । এক্ষেত্রে আমি ব্যবহার করব সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র "Some East Pakistan Painters' প্রবন্ধটি ।

""Absence of regionalism is perhaps the outstanding feature of most the painters of East Pakistan today .Although it is very difficult to say wheather the scores of paintings that leave the easel of these arists indicate any particular trend, it can be safely said owever that they furnish an impressive proof of their productive vigour and their aspirations unequalled in my stage of the artistic development of the region.

Zainul Abedin is undoubtedly the pioneer among the modern artists of East Bengal .He is a powerful artist and possesses an exquisite sense of colour .The main reason of his being able to attention of art critics in the early stages of his development is the breath of fresh air which he infused into the painting of those days which had a marked tendency to be cold and lifeless. For some years he painted with unusual avidity the landscape of East Bengal which seemed to intrigue him beyond measure by its nuances and intrinsic delicacy. The appeal his landscapes made to the sensuous perception was irresistible

Zainul Abedin's painting suffered an appreciable break after this distinctive phase during which he proud forth famine sketches .He is again back to his water-colour and oil. But always now one notices behind the grandeur and solidity of his composition sadness; hi vision is haunted.

One of his recent water -colours depicts a silent procession of the grieved, sorrowful people wending their way to Quaid-e-Azam's simple grave .The paintign is the embodiment of the national tragedy as well as the people's profound love and regard for the Father of the Nation.

The talent of Safiuddin Ahmead, who is junior to Zainul Abedin by only a couple of years, came to be recognised just about the time Zainul Abedin started basking in the sun of his sudden fame. Though his grasp of the rich texture of life seems to be more firm than Zainul Abedin's, he is apparently under the control of some unexplainable force majeure .And in the consequent dualism,

his perception weakens and often his paintings become cameos of nostalgic dreams .There is in his paintings an unconscious display of deep, ruffled peotic emotions .In spite of the thoroughness, the minute details, the exquisite sense of colour and occational bright reflection of the sunny Pre-Raphaelites,the artist's entire polychromous design seems to draw inside instead of projecting .Whatever the subject, whether it is about homeward- bound buffaloes along a row of tall eucalyptus tree or a pair of sleepy birds in a cosy nest-there is always an unapproachable remoteness.

Like those of Zainul Abedin's, Safiuddin Ahmad's paintings have also been exhibited in London, Paris and Singapore, and have earned him a wide reputation .He has undoubtedly broken new ground in the field of art in this country in as much very few artists have so far specialised in what might be called technical forms of paintings. For some years past he had been busy in mastering aquatint and dry-point. He is also a very good at wood engraving. This varied interest in the technical forms of communicating the artistic emotions makes him explore with greater zeal the intrinsic variations of rhythm as well as colour which are less responsive to the ordinary eye than the obvious, prismatic beauty. The quintessence of his painting, therefore, lies not in the formalism but in the search which is more than often caught in the interacting forces of known and unknown sentiments .Precisly for this reason Safiuddin Ahmad's landscape are rare. All his earlier efforts to paint a real landscape in the arid tracts of Santhal Pargana in Bihar failed; the recent landscape of the riverside scenes in East Bengal show no improvement.One detects in these cases the evident inspiration which is not direct and, therefore,does not tally with the peculiar expressive urge of his subtle,and perhaps, forlorn mind.

Among the less prominent but nonetheless talented artist, first comes Qamrul Hasan, who combines in himself the power to enjoy lavishly the physical abundance of life and a sensuous, artistically impulsive mind. The mode of his

expression tends to become rather violent and florid, the vulgarity of which is fortunately compensated to a great extent by the force of his presention. Next comes perhaps Anwarul Huq, paintings revel a definite and likeable style. What strikes one most is his tendency to select unusual subjects of painting. This tendency has led him to wander in the snow-capped hill-places, trying to arrest with the help of the brush something seen from an uncommon angle-perhap a rickety, wooden balcony with a square background of cloudy, drizzling sky; a tea garden which rises a wide flight of stairs, or an old Pathan whose eyes, face and bread all posses an angular sharpness. The reminiscences of the not unpleasant days passed i his boyhood in the interior of East Africa still painfully disturb him as he perhaps feels he has felt be real subjects there where nature yet wears an unfaded, biosterously youthful appearance. Anwarul huq's colour composition sometimes seems drab but that is because he has a pronounced dislike for bright colour. Instead, he prefers to give his paintings a subdued glow.

Khawja Shafique Ahmed claims the attention of art connoisseurs mainly because of the solemnity of his mission. He is one of those artistis who seek beauty not there where it is blatantly significant but where it lies hidden and is therefore more delicate. The landscapes as a whole appear to him to be hazy and undefined; individual objects are not studied specifically as they seem to have no value as compared with composite beauty. This is reflected in his painting .Yet one feels the presence of a more delicate beauty behind the seeming rough structure of his landscapes .''[21]

[Pakistan Miscellany. 1952]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র এই প্রবন্ধটি ১৯৫২ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান পাবলিকেশন থেকে Pakistan Miscellany নামক সংকলন গ্রন্থে প্রকাশিত হয় । মূল গ্রন্থটি সাতটি অংশে বিভক্ত ছিল । যথা :

1. Background
2. Archaelogy

3. Architecture
4. Literature
5. Painting
6. Music
7. Landscape

এদের মধ্যে চিত্রকলা প্রসঙ্গে সূচিপত্রটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি--

1. The Treatment of Nature in Mughal Painting : Eric C. Dickinson
2. Abdur Rehman Chughtai : Agha Abdul Hamid
3. Fyjee-Rahmin: S.N. Qutb
4. Some East Pakistan Painters : Syed Waliullah
5. Zainul Abedin- A Humanist in Art : N. Sengupta
6. Contemporary Art in Pakistan : Azra Zaman .

১৮৮ পৃষ্ঠার এই বৃহদাকার গ্রন্থের শুরুতেই ছিল চুঘতাই এর একটি বহুবর্ণ চিত্র । চিত্রকলা-- অংশে তিনজন চিত্রশিল্পীর প্রতিকৃতি ছিল : আব্দুর রহমান চুঘতাই, জয়নুল আবেদিন ও জুবায়দা আগা-র । আব্দুর রহমান চুঘতাই ও ফাইজি রাহামিনের অঙ্কিত দুটি ছবির সঙ্গে জয়নুল আবেদিনের দুটি ছবি এতে স্থান পেয়েছিল । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তিনটি রচনাও এতে স্থান করে নিয়েছিল । লিখেছিলেন -সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, মুহম্মদ হোসেন এবং মীজানুর রহমান । মীজানুর রহমান লিখেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে । আবার বাঙালি লেখক-কবিদের মধ্যে তিনজনের প্রতিকৃতি গ্রন্থটিতে ছিল। তাঁরা হলেন-কাজী নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা এবং জসীমউদ্দিন ।

মোটকথা কলকাতা অবস্থান কালে তিনি যে লেখালেখিতে পূর্ণ মনোনিবেশ করতে পেরেছিলেন তার একটা কারণ হয়ত এই সাহিত্যিক পরিমন্ডল । পেশাগত ক্ষেত্র ছাড়াও এই সময়ে তাঁর যাদের সঙ্গে হৃদ্যতা তৈরি হয় তাঁরাও প্রায় সকলেই ছিলেন বাংলা সাহিত্যের এক একজন দিক্‌পাল ব্যক্তিত্ব । যেমন-পূর্বাশা পত্রিকার সম্পাদক কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য ,স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সহকারী সম্পাদক কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) এবং তাঁর পত্নী রাজেশ্বরী দত্ত, চতুরঙ্গ পত্রিকার দায়িত্বে থাকা আতোয়ার রহমান প্রমুখ । এছাড়া ছিলেন শাহেদ সুহরাওয়ার্দী (১৮৯০-১৯৬৫), ঔপন্যাসিক-সমালোচক গোপাল হালদার রবীন্দ্র-দর্শন ও

রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবুদ্ধ ব্যক্তিত্ব কাজী আব্দুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), আবু সয়ীদ চৌধুরী (১৯২১-১৯৮৭),মোহাম্মদ নাসির আলী (১৯১০-১৯৭৫), এ.কে. নাজমুল করিম (১৯২১-১৯৮২), আবু সয়ীদ আইয়ুব, বিষ্ণু দে, হৃষিকেশ লাহিড়ী, কবি গোলাম কুদ্দুস, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, আবু জাফর শামসুদ্দীন, আবুল হোসেন, পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রী ও রাষ্ট্রদূত সৈয়দ নাজমুদ্দিন হাশেম ও তাঁর পত্নী নূরুন নাহার হাশেম, মানবেন্দ্র রায় । মোটকথা, এই সময়ে কলকাতার বহু প্রগতিশীল লেখকদের সঙ্গে ওয়ালীউল্লাহ্‌র ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় । তবে রুচি, স্বভাব ও আভিজাত্যবোধে মিল থাকা এবং একসাথে কাজ করার ফলেই হয়ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং তাঁর স্ত্রী রাজেশ্বরী দত্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা একসময়ে প্রায় পারিবারিক সম্পর্কে গিয়ে পৌঁছায়। ১৯৪৭ সালের পরে ওয়ালীউল্লাহ্‌ ঢাকায় চলে এলেও তাঁদের এই সম্পর্কে কোন ছেদ পড়েনি। পরে অ্যান-মারির সঙ্গে ওয়ালীউল্লাহ্‌র বিবাহ হলে তাঁর সঙ্গেও দত্ত দম্পতির ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় । দেশ বিভাগের পর ১৯৫১ সালে ওয়ালীউল্লাহ্‌ যখন নতুন দিল্লিতে পাকিস্তানের হাই কমিশনে কর্মরত তখন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন দামোদরের জনসংযোগ অফিসার । কাজের প্রয়োজনে তাঁকে প্রায়শই দিল্লি যেতে হত । আর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের দিল্লি যাওয়া মানেই সস্ত্রীক ওয়ালীউল্লাহ্‌র আতিথ্য গ্রহণ। একাধিক বার তাঁরা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ফ্ল্যাটে সময় কাটিয়েছেন । ওয়ালীউল্লাহ্‌ এবং অ্যান-মারি ইউরোপে থাকাকালীনও এই দুই পরিবারের মধ্যে হৃদ্যতা বজায় ছিল । রাজেশ্বরী দত্তের পরিচয় শুধুমাত্র কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের স্ত্রী-র মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি নিজে ছিলেন শান্তিনিকেতনের ছাত্রী এবং বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী। ১৯৬০ সালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মারা যান । তাঁর মৃত্যুর পরে রাজেশ্বরী দত্ত লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র সংগীতের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন । সেই সময়ে এবং অন্য আরো অনেক সময়েও তিনি অনেকবার প্যারিসে ওয়ালীউল্লাহ্‌র পরিবারের অতিথি হয়েছেন । ওয়ালীপরিবারে তিনি এক পারিবারিক সদস্য হিসেবেই সাদরে গৃহীত হতেন । নিঃসন্তান রাজেশ্বরী দত্তের সঙ্গে সিমিন এবং ইরাজেরও খুব আন্তরিক সম্পর্ক ছিল । তিনি তাদের খুব ভালোবাসতেন । তাঁদের এরকমই একটি সমাগমের চিত্র আমরা পাই নাজমুদ্দীন হাশেমের পত্নী নূরুন হাশেমের এক স্মৃতিচারণায়--

*''ওয়ালী দম্পতির সাথে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৬৭ সালে । আমার স্বামীর পোস্টিং হয় প্যারিসে । তৎকালীন পাকিস্তান দূতাবাসে প্রেস এতাশে [প্রথম সচিব] রূপে সৈয়দ*

*ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাক্সেসর হিসেবে, এবং মনে পড়ে সেদিনের কথা যে দিন আমরা প্যারিসে পৌঁছাই, ওয়ালীদম্পতি বিমানবন্দরে এসেছিলেন আমাদের রিসিভ করতে ।বলতে ভুলে গেছি ওয়ালী ও হাশেম ছিলেন বহুকালের বন্ধু । তখন ছিল সামার, তাঁরা হোটেলে প্রথমে নিয়ে যান এবং তারপর আমরা তাঁদের বাড়িতে যাই এবং খাওয়া-দাওয়ার পর সারা প্যারিস শহর ঘুরিয়ে রাতে হোটেলে পৌঁছে দেন । ওয়ালী ভাইয়ের সৌম্য চেহারা এবং সদা হাস্যময়ী মুখ ও অমায়িক ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম । প্রায় প্রতিদিনই আমরা মিলিত হতাম। বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত গায়িকা রাজেশ্বরী দত্ত ছিলেন এই দম্পতির পরম বন্ধু । তিনি একবার লন্ডন থেকে বেড়াতে এসেছিলেন এই দম্পতির কাছে । এক সন্ধ্যায় আমরা নিমন্ত্রিত হলাম রাজেশ্বরী দত্তের সাথে পরিচিত হতে । রাজেশ্বরী দত্ত নিজে হাতে রান্না করলেন এবং অ্যান-মারি রান্না করেছিলেন কুকিং এ্যাপেল দিয়ে গরুর গোস্ত ভুনা । ডিনারের পর শুরু হল রাজেশ্বরীর গান । আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনলাম ।তারপর কবিতা ।আমার স্বামী সুধীন দত্তের কয়েকটি কবিতা পড়ে শুনালেন । রাজেশ্বরী দত্ত বলেছিলেন,'আমি যেন সুধীনের গলা শুনছি।' এই রকম স্মৃতি আমার মনে গেঁথে আছে । কি বলবো । আমরা দু' পরিবার প্রায়ই উইকেন্ডে লং ড্রাইভে চলে যেতাম ।'*[২২]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ দিল্লীতে পাকিস্তান হাই কমিশনে কর্মরত থাকার সময়ে তাঁর পরিচয় হয় বিচারপতি ইসমাইলের সঙ্গে । এছাড়া তাঁর আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে হুমায়ূন কবির, আতাউর রহমান,ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মওলানা আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব তবারক হোসেনের সঙ্গে । সকলের সঙ্গেই তাঁর খুব ভালো সম্পর্ক ছিল । আসলে প্রেসের দায়িত্বে থাকায় ওয়ালীউল্লাহ্‌র পক্ষে সকলের সাথেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্পর্ক রাখা সহজ হয়েছিল ।

প্রথম অধ্যায়ের এ পর্যন্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ঘনিষ্ঠজনেরা কেউ সাধারণ মেধার মানুষ ছিলেন না । তাঁরা কেউ ছিলেন ভাবুক,কেউ সৃষ্টিশীল, আবার কেউবা তীক্ষ্ণধী সম্পাদক ও সচেতন সংস্কৃতি কর্মীরূপে খ্যাত ও নন্দিত । এরকম একটি পরিমন্ডল যার, ছোটবেলা থেকেই যে তাঁর বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটবে তা বলাই বাহুল্য। সাহিত্যের প্রতি ওয়ালীউল্লাহ্‌র একটা আকর্ষণ তাঁর ছোটবেলা থেকেই ছিল । তাঁর লেখক সত্তার বিকাশও ঘটেছিল খুব অল্পবয়সেই । তিনি যখন স্কুলে পড়তেন তখন বন্ধুদের

সহযোগিতায় প্রকাশ করেছিলেন দেওয়াল পত্রিকা 'ভোরের আলো' । তার এক স্কুল সহপাঠীর ভাষায়--

*''কৈশোরে তাঁর জিজ্ঞাসু ও সংস্কৃতিমুখী মনের সংস্পর্শে আমি আসি ।..... সে যে আর দশজন থেকে আলাদা, এ কথা সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে পড়ত । ১৯৬৩ সালে ফেনী হাইস্কুলে 'হাউস সিষ্টেম' চালু হয় । বিভিন্ন হাউসের ভেতর খেলাধুলার বন্দোবস্ত বৃটিশ সরকারের নির্দেশে হয়েছে, যাতে ছাত্ররা সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি থেকে দূরে থাকে । আমরা প্রস্তাব করলাম যে, খেলাধূলার সাথে সাথে প্রত্যেক হাউস থেকে এক একটি হাতে লেখা ম্যাগাজিন বের করা হোক । ওয়ালীউল্লাহ্ হলো হাউসের ম্যাগাজিন সম্পাদক । ওয়ালীউল্লাহ্ নিজে হাউসের পত্রিকার নাম সাধ ক'রে রাখলো, 'ভোরের আলো' ।''*[২৩]

তবে শুধু ঘনিষ্ঠজনের প্রভাবই নয় ওয়ালীউল্লাহের জীবনে রয়েছে বিভিন্ন স্থানেরও প্রভাব । যেমন ওয়ালীউল্লাহের ময়মনসিংহ অবস্থান তাঁর জীবনদর্শন-পুনর্গঠন ও সাহিত্য-সাফল্য উভয় দিক থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তাঁর 'প্রকল্প' (ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩) ও 'তুমি' (গ্রীষ্ম ১৩৫০/১৯৪৩), 'চিরন্তন পৃথিবী' (পৌষ ১৩৪৮), 'চৈত্রদিনের দ্বিপ্রহরে' (মাঘ ১৩৪৮), কবিতাদ্বয়, 'অনুবৃত্তি' (কার্তিক ১৩৪৯), 'ঝোড়ো সন্ধ্যা' (বৈশাখ ১৩৪৯), 'দ্বীপ' (ফাল্গুন ১৩৪৯), 'পথ বেঁধে দিল (আশ্বিন ১৩৪৯), 'প্রাস্থানিক' (ভাদ্র ১৩৪৯), 'সাত বোন পারুল' (ফাল্গুন ১৩৪৯), 'ও আর তারা' (পৌষ ১৩৫০), 'প্রবল হাওয়া ও ঝাউ গাছ' (বৈশাখ ১৩৫০) ইত্যাদি গল্প এবং 'খেয়া' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । শুধু ময়মনসিংহ-ই নয় ওয়ালীউল্লাহের বাংলার যে কোন স্থানের সরল গ্রামীণ জীবনের প্রতি একটা অকৃত্রিম মমতা ছিল । মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ফেনী, কুড়িগ্রাম যে স্থানেই তিনি গিয়েছেন সেখানকার গ্রামবাসী, মাঝি-মাল্লাদের সঙ্গে মেশার চেষ্টা করেছেন । তাঁর এ অভ্যাস বিদেশে গিয়েও পরিবর্তিত হয় নি । তাই স-পুত্র, কন্যা, স্ত্রীকে নিয়ে প্যারিস থেকে এসে তিনি যখন তাঁর বিমাতার বাবার বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার করোটিয়ায় ঘুরতে যান তখনও তাঁকে দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে তাঁর আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে মিশতে, সেখানকার গ্রামবাসীদের ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দ নোটবইতে টুকে রাখতেন। এছাড়াও ওয়ালীউল্লাহের জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা মাসিক সওগাত-এর তৎকালীন সম্পাদক, বিশিষ্ট কথা শিল্পী কাজি আফসারউদ্দিনের (১৯২১-১৯৭৫) সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা স্থাপন । এই সান্নিধ্য ও আলাপচারিতার ফলেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের্ সাহিত্যের বিষয়াঙ্গিক, প্রকৌশল, মুসলিম সাহিত্যচর্চার ধারা ইত্যাদি সম্পর্কে নিজস্ব ও স্বাধীন

অভিমত গঠিত হয় । পরবর্তীতে ১৯৩৯ সালে তিনি যখন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পড়তেন তখনও মাত্র সতের বছর বয়সে তাঁর প্রথম ছাপা গল্প 'সীমাহীন এক নিমেষে'-তে তাঁর লেখনী শক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে । এক্ষেত্রেও বিশেষভাবে উল্লেখ্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান সামাজিক ও রাজনৈতিক, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সকল দিক থেকেই সে সময়টি ছিল ভীষণভাবে উত্তপ্ত । স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক মাস্টারদা সূর্য সেন (১৮৯৩-১৯৩৪)-এর ফাঁসি, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ক্ষমতা লাভ, ১৯৩৯ সালে ভারতের প্রাদেশিক সরকারসমূহের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক একতরফা যুদ্ধ ঘোষণা, যুদ্ধসৃষ্ট অর্থসংকট ও নৈতিক বিপর্যয়, ১৯৪০ সালের ২৩-শে মার্চ শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক কর্তৃক পাকিস্তান প্রস্তাব (যা প্রথমে লাহোর প্রস্তাব হিসেবে পরিচিত ছিল), ১৯৪১ সালে ঢাকার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, 'প্রগতিলেখক ও শিল্পী-সংঘ' কর্তৃক ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী-সংঘ (১৯৪২) প্রতিষ্ঠা, আগস্ট বিপ্লব, পঞ্চাশের মন্বন্তর ,রশীদ আলীর মুক্তি আন্দোলন ইত্যাদি ঘটনার মাধ্যমে এ কাল পরিসর ছিল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবর্তে তরঙ্গায়িত ও সংক্ষুব্ধ পরাধীন ভারতবাসীর স্বাধিকার আন্দোলন ও পুনরুদ্ধার-চেষ্টায় প্রদীপ্ত । বহির্জগতের এই ঘটনাবলি তৎকালীন তরুণ সম্প্রদায়ের অন্তর্জগতকে নির্মাণ করতে থাকে । সংশয়ের দোলায় দুলতে দুলতে তাদের মধ্যে কেউ কেউ বেছে নেয় সাম্প্রদায়িকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার পথ আবার কেউ কেউ বেছে নেয় প্রগতিশীলতার পথ । বহুক্ষেত্রে যাদের শিক্ষা সম্পন্ন হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যালকাটা মাদ্রাসা কিংবা অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজে । সেদিক থেকে গোড়া থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র ছিল সাম্প্রদায়িকতা বর্জিত এবং পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনাস্পর্শী । ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে পূর্ব-বাংলার মুসলিম তরুণ-মানস আলিগড়ের সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে যেমন মুক্তি লাভের সুযোগ পায়, তেমনি প্রথাগত সামাজিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে সজাগ ও সোচ্চার হওয়ার সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি খুঁজে পায় । প্রতিষ্ঠলগ্নের শুরু থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল উপমহাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্বতন্ত্র। এর সামগ্রিক কর্মকান্ডে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ অনুসৃত হলেও সমসাময়িককালে শিক্ষা ও গবেষণার স্বীকৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক গৌরবময় স্বাতন্ত্র অর্জন করে । শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। হরপ্রসাদ

শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪), জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (১৮৯৪-১৯৫৯), চারু বন্দোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), হরিদাস ভট্টাচার্য, সুশীল কুমার দে (১৮৯০-১৯৬৮), হীরেন্দ্রলাল দে (১৮৯৪-১৯৭৪), সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪) প্রমুখ অধ্যাপক গোড়া থেকেই অসাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তি দানে সমর্থ হয়েছিলেন । সংখ্যায় কম হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার প্রথম দশকে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ফজলুর রহমান (পরবর্তীকালের উপাচার্য স্যার এ.এফ রহমান), অর্থনীতি ও বানিজ্য বিভাগের আবুল হোসেন, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের কাজী মোতাহের হোসেন (পরবর্তীকালে ডক্টর ও সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ), ইংরেজি বিভাগের মাহমুদ হাসান (পরবর্তীকালে ডক্টর ও উপাচার্য), বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (পরবর্তীকালে ডক্টর ও অধ্যক্ষ), ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শামসুল ওলামা আবু নসর মুহাম্মদ ওহীদ, ফারসী বিভাগের ফিদা আলী খান, আরবী বিভাগের সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন (পরবর্তীকালে ডক্টর ও উপাচার্য) প্রমুখ কৃতি শিক্ষকবৃন্দ পূর্ব বাংলার জ্ঞানপিপাসু তরুণ সমাজের মধ্যে জাগরণের হাওয়া বইয়ে দিতে পেরেছিলেন । তাই বাঙালি মুসলমান সমাজের প্রগতিশীল চেতনার ইতিহাসে তাঁদের এই মূল্যবান ভূমিকার কথা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত সমাজের অগ্রযাত্রার পটভূমিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তরুণমানসে সময়, সমাজ, ইতিহাস ও রাজনীতি-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চারে অনেকাংশে সমর্থ হয়েছিলো । এবং একথাও উল্লেখযোগ্য যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলেই পূর্ববঙ্গে মুসলমান সমাজে একটি শিক্ষিত মধ্য-শ্রেণির উদ্ভব সম্ভব হয় ।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ববাংলার জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় এবং এ-সময়কাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজ উত্তীর্ণ নব্যশিক্ষিতের সমন্বয়ে ক্রমবিকশিত হতে থাকে ঢাকাকেন্দ্রিক নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণি । সামন্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি, য়ুরোপীয় বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা, যুক্তিবাদ-মানবতাবাদকে অঙ্গীকার কল্পে ১৯২৬-এ প্রতিষ্ঠা করেন- 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এবং প্রকাশ করেন মুখপত্র 'শিখা'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমন্ডলে গড়ে উঠেছিল 'মুসলমান সাহিত্য সমাজের' কার্যক্রম। এই সংগঠনের আদর্শ ছিল-'চিন্তাচর্যা, জ্ঞানের সমন্বয়সাধন এবং সংযোগসাধন।' 'শিখা' পত্রিকার মূল বক্তব্য ছিল-'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ,বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' পূর্ববঙ্গে রেঁনেসার সমধর্মী চেতনায় উদ্দীপ্ত এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন প্রধাণত

সৈয়দ আবুল হুসেন, কাজী আব্দুল ওদুদ, আবুল ফজল, কবি আব্দুল কাদির, অধ্যাপক শামসুল হুদা, মোখতার আহমদ সিদ্দিকি, কাজী আনোয়ারুল কাদির প্রমুখ। এই গতিশীল আন্দোলনের মূল মন্ত্র ছিল- 'বুদ্ধির মুক্তি' । এই মন্ত্র তাঁরা এক জায়গা থেকে আহরণ করেননি । বহু জায়গা থেকে তা আহৃত হয়েছিল । কখনো তা কামাল আতার্তুকের কাছ থেকে, কখনো বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে, আবার কখনো বা জাঁ ক্রিস্তফের লেখক রোমাঁ রোলা বা পারসিক কবি শেখ সাদীর কাছ থেকে । মোটকথা মুসলমান সমাজের বিচারবুদ্ধিকে অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্তিদানের ঐকান্তিক অভিপ্রায় এ-সংগঠনের কর্মকান্ডকে দান করেছিল বিশিষ্টতা। সমকালীন মুসলিম তরুণমানসকে মুক্তচেতনায় উদ্দীপ্ত করার ক্ষেত্রে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এক কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে । সৈয়দ আকরম হোসেনের 'বাংলাদেশের উপন্যাস : চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পজিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ' গ্রন্থ থেকে আমরা তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ইয়ংবেঙ্গলদের সম্পর্কে জানতে পারি । মোখতার আহমেদ সিদ্দিকীর উক্তিতে-- 'মুসলমানের ধর্ম নাই-তার জীবন নিতান্ত কুৎসিত' অথবা আনোয়ারুল কাদিরের লেখায়- 'রাস্তায় চলতে মুসলমান বালক-বালিকার অস্বাভাবিক আলাপ ও গতিবিধি দেখলে রাগ করুন আর যাই করুন মুসলমান বলে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করি' কিংবা সে সময়ের-- Swiming Club, Eating Club, Laughting Club, Anti-Pardah League-এর প্রাণশক্তিতে বহুলাংশে ইয়ংবেঙ্গলীয় উল্লাস, বেদনা ও উদ্দামতার সাদৃশ্য আছে ।বস্তুত এরাই ছিলেন পূর্ববঙ্গের ইয়ং বেঙ্গল । এভাবেই 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর ভাববিপ্লবের সংঘাত-তরঙ্গে বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের গণজাগরণ এক গতিশীল ও ভবিষ্যৎসঞ্চারি চারিত্রধর্ম লাভ করে । এই সংগঠনের প্রেরণা-উৎসে মুস্তফা কামালের উদ্যম মুখ্য ভূমিকা পালন করলেও এর যোগ ছিল বাংলার বা ভারতের সে কালের জাগরণের সঙ্গে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর এই কর্মতৎপরতা ও সাহিত্যচর্চা বাংলার মুসলিম-মানসে যে নবজাগরণের ধারা সৃষ্টি করে তা বাংলাদেশের স্বতন্ত্র সাহিত্যযাত্রার পটভূমি তৈরিতে এক দূরসঞ্চারী ভূমিকা পালন করে ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যের গতিনির্দেশক সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রও গড়ে উঠেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই পরিমন্ডলে । সুকুমার সেনের ভাষায়--

*''কল্লোলের বীজ বপন হইয়াছিল ঢাকায়,-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাত্রদের বার্ষিক পত্রিকা 'বাসন্তিকা'য় (১৯২২) । স্বভাবতই বিদ্যালয় ও ছাত্রনিবাসের আওতায় এ বীজ সতেজে প্ররূঢ়ই হইতে পারে নাই । কল্লোলের প্রবাহ কিছুদূর গড়াইলে পর ইহার আর একটি*

*কচি শাখা বাহির হইয়াছিল ঢাকায়-'প্রগতি' (১৯২৭) । কলিকাতায় আগেই গজাইয়াছিল- 'কালি-কলম' (১৯২৬) । তখন সাধারণ বাঙালী পাঠক শরৎচন্দ্রের গল্পে মশগুল ও কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় বিভোর । কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির পোষকেরা রবীন্দ্র-ঐতিহ্যে জাত ও পুষ্ট হইলেও রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমগ্র মহিমা ইঁহাদের গোচর অথবা উপলব্ধ হয় নাই । তাহার একটা প্রধান কারণ, রবীন্দ্র-ঐতিহ্য যে প্রাচীনতর ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নাই সে বোধ তাঁহাদের ছিল না । আর একটা কারণ, নব নব সৃষ্টির অভিমুখে রবীন্দ্র সাহিত্যের গতিশীলতা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই । তা ছাড়া আধুনিক বিদেশী সাহিত্যের দ্বারা ইঁহারা অনেকটাই অভিভূত ছিলেন এবং সেই প্রভাবের ফলে ইঁহারা যেন এক হাতে শাস্ত্র আর এক হাতে শস্ত্র লইয়া বাহির হইয়াছিলেন । অর্থাৎ রচনা করিতে লাগিলেন এবং সেই রচনার প্রচার জোর গলায় করিতে থাকিলেন । সৃষ্টি ও প্রচার দুই কাজ সমান জোর দিয়ে করিতে গিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই ইঁহাদের রচনায় ও প্রচারে উদগ্র ও আতিশয্য দেখা দিল । ইঁহারা প্রবল বাধা বলিয়া মনে করিলেন প্রথমেই উপেক্ষিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের রচনামুগ্ধ বাঙ্গালী পাঠককে । ইঁহাদের আত্মশক্তিতে অগাধ আস্থা । ইঁহাদের দৃঢ় ধারণা-যেহেতু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দীর্ঘকাল কলম চালাইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন সেই হেতু তাঁহারাও বেশিদিন বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার অতিরিক্ত সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন । ইহার প্রমাণ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতা 'আবিষ্কার'-অর্থাৎ আত্মাবিষ্কার ।*

*এ মোর অত্যুক্তি নয়, এ মোর যথার্থ অহঙ্কার,*
*যদি পাই দীর্ঘ আয়ু, হাতে যদি থাকে এ লেখনী,*
*কারেও ডরিনা কভু ; .....*
*পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,*
*সম্মুখে থাকুন বসে' পথ রুধি' রবীন্দ্র ঠাকুর,-*
*আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো*
*যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে । মোর পথ আরো দূর ।*

*.....*

*গভীর আত্মোপলব্ধি এ আমার দুর্দান্ত সাহস*

*.....*

*ভবিষ্যৎ বৎসরের শঙ্খ আমি -নবীন প্রেরণা !*

*আপনারে তাই নমস্কার ।*

*চক্ষে থাক আয়ু ঊর্মি, হস্তে থাক্ অক্ষয় লেখণী !*

*স্পষ্ট রবীন্দ্র-বিদ্বেষ না থাকিলেও রবীন্দ্র-বিমুখতা ছিল অনেকেরই । ঢাকাই (বিশ্ববিদ্যালয় ও সাহিত্য) সমাজ রবীন্দ্রনাথের স্থানে গদ্যে বঙ্কিম ও শরৎচন্দ্র কাব্যে মাইকেল ও নজরুলকে বসাইয়াছিল, এ কথা স্মরণীয় ।*

*''তরুণ'' সাহিত্যিকদের বিশিষ্ট মনোভাবের মধ্যে খানিকটা ছিল রবীন্দ্র-বিমুখতা এবং অনেকটা ছিল শরৎ-প্রীতি ।*

*.....*

*ঢাকার দল ভাঙ্গিয়া গেলে পর প্রগতিচালকদের কেন্দ্র কলকাতায় উঠিয়া আসিল । ঢাকায় যে অবশেষ রহিয়া গেল তাহা প্রগতিচালকদের বামপন্থী , সুতরাং তাহাদের ঘোরতর বিদ্বেষ্টাও, বলা চলে । প্রগতিবাদীদের সঙ্গে এই বামপন্থীদের মিল ছিল শুধু রবীন্দ্র-বিদ্বেষে । যতদিন প্রগতিওয়ালারা রবীন্দ্রবিমুখ ছিলেন ততদিন বামপন্থীরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেন নাই । এখন অবস্থা পাল্টাইয়া যাওয়ায় ইঁহারা দুই ফ্রন্টে যুদ্ধ চালাইবার জন্য সাজিয়া আসিলেন । যুদ্ধ আসলে একাই চালাইলেন সব্যসাচী মোহিতলাল মজুমদার-লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি, একদা রবীন্দ্রভক্ত ও ভারতী-গোষ্ঠীভুক্ত, অধুনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের ব্যাখ্যাতা । (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গোড়ার দিকে রবীন্দ্রবিমুখ ছিল।) মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথকে খর্ব করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেলকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া একটা ''বঙ্কিম-মধুসূদন'' কাল্ট্ বানাইতে ব্রতী হইলেন । মোহিতলাল (তথা ঢাকার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যক্ষ ড. সুশীল কুমার দে এবং আর দুই একজন) প্রকাশ্যে ভর করিলেন সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় (১৯৩৩)।''*[২৪]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন আইন বিভাগের শিক্ষক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের পাপের ছাপ (১৯২২), বিপর্যয় (১৯২৪), রাজগী (১৯২৫) প্রভৃতি উপন্যাস যুদ্ধোত্তর জীবননীতি ও শিল্পনীতির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে । মানুষের 'জটিল জীবন সমস্যা'-কে তিনিই প্রথম বাংলা কথাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেন । তাঁর নাটক 'আনন্দ মন্দির' মঞ্চায়িত হয় জগন্নাথ হল ইউনিয়ন কর্তৃক কার্জন হলে, ১৯২২ সালে । এর থেকে বোঝা যায় জন্মলগ্ন থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে একটা সুস্থ ও সজীব সাংস্কৃতিক অভিরুচি সৃষ্টির সহায়ক হয়েছিল । বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্তের যৌথ প্রয়াসে ঢাকা থেকে মাসিক সাহিত্য পত্রিকা

প্রগতি প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালের জুন মাসে । এই পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতি নির্দেশ করেন-যা রবীন্দ্রোত্তর কালের বিদ্রোহী সাহিত্যিকগোষ্ঠীর মুখপত্র কল্লোল-এরও আরাধ্য হয়েছিল । যুদ্ধোত্তর আর্থ-সামাজিক অব্যবস্থা, 'জীবনসংগ্রামের কঠোর প্রতিযোগিতা' এবং 'দারিদ্র্যের তান্ডব-নৃত্যের নিষ্ঠুর পদাঘাতে' বিপর্যস্ত বাঙালির সমকালীন যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনজিজ্ঞাসাকে বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রবন্ধে উপস্থাপিত করলেন । বুদ্ধদেব বসুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ মর্মবাণী-ও প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে ১৯২৪ সালে । কল্লোল-এর সমসাময়িক কালে পরিমলকুমার ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা প্রাচী (১৯২৩) ছিল পূর্ব বাংলার পক্ষে অভূতপূর্ব । এভাবেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমন্ডলে এক অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরেপেক্ষ, মানবমুখী, মুক্তচেতনায় প্রদীপ্ত, পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্য-দর্শন পরিস্রুত সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল । পরবর্তীতে ১৯৩৯ সালে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ে পড়তে আসেন তখনও তিনি এই পরিবেশই পান । ওয়ালীউল্লাহ্ নিজে সরাসরি রাজনীতির  সঙ্গে যুক্ত না হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়েই তিনি ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘের সাথে পরিচিত হন । সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২)-সহ আরো অনেকেই তখন প্রগতি লেখক সংঘের সক্রিয় কর্মী । ওয়ালীউল্লাহ্ যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন ঢাকা কলেজের অধ্যাপক কাজী আব্দুল ওদুদ, পরিমল ঘোষ প্রমুখ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রতিষ্ঠিত ফজলুল হক মুসলিম হলের হাউস-টিউটর কাজী মোতাহের হোসেনের থেকে প্রগতিশীল কর্মপ্রেরণা পেয়েছেন । আবার ১৯৪০-এর শীতকালে কাজী নজরুল ইসলাম যখন ফজলুল হক হলের ছাত্রদের সাথে মিলিত হন তখন ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ পান, যদিও কবির মধ্যে তাঁর স্বভাবসুলভ প্রাণচাঞ্চল্য একেবারেই ছিল না ।

১৯৩৯ সালে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন দর্শনের অধ্যাপক ড. মমতাজউদ্দিন আহম্মদ । তিনি ছিলেন অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং একজন বিদগ্ধ শিক্ষক । দর্শন বিষয়ে তাঁর বেশ কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ রয়েছে । সেই সময়ে আট সদস্য বিশিষ্ট কলেজ পরিচালনা পরিষদে ছিলেন পদাধিকার বলে বিভাগীয় কমিশনার, দর্শনের অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য, সুলতান উদ্দিন আহমদ, কাজী আব্দুল ওদুদ এবং এ.ইউ.এম. ওয়ালীউল্লাহ্ । এঁদের মধ্যে শেষের দুজন ছিলেন শিক্ষক

প্রতিনিধি । সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র লেখক ওয়ালীউল্লাহ্‌ হয়ে ওঠার পেছনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অনেকখানি।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনে ময়মনসিংহ এবং ঢাকার মতই কলকাতারও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । ১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি নিয়ে এম.এ. পড়ার জন্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ যখন কলকাতা পৌঁছান তখন চল্লিশের দশকের সেই কলকাতা ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সকল দিক থেকেই উদ্বেল । সবদিক থেকেই সেই সময় শুধু বাংলাদেশই নয়, সমগ্র বিশ্বেই চলছিল টালমাটাল অবস্থা । সেদিনকার সেই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজনৈতিক পটভূমিটির চেহারা স্পষ্ট করে বুঝতে আমাদেরকে সময়ের বিচারে একটু পিছিয়ে যেতে হবে । সেদিনের রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা চিন্তাশীল মানুষকে প্রভাবিত করেছিল । প্রথম মহাযুদ্ধের কোল ঘেঁষেই ঘটেছিল আধুনিক যুগের পৃথিবীর সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা - রুশ বিপ্লব, ১৯১৭-থেকে ১৯২১-এর মধ্যে রচিত হল তার সফলতার ইতিহাস । মানুষের ভূগোলে  সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার উদ্ভব শুধু রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের দৃষ্টান্ত মাত্র নয়, মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও চেতনার ধাত একেবারে বদলে দেওয়ার এক সফল পরীক্ষাও বটে । দ্বান্দ্বিক জড়বাদ মানুষের সামাজিক অস্তিত্বে ও জীবন দর্শনে যে নতুন জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলেছিল, রুশ বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার সত্যতা স্থিরীকৃত হয়ে গেল । তার বার্তা সমগ্র বাংলা তথা ভারতবর্ষে পৌঁছতে বিশেষ দেরি হল না । অপরদিকে ১৯১৯ সালের এক বক্তৃতায় বিপিনচন্দ্র পাল কম্যুনিজমের আবির্ভাবের কথা ঘোষণা করলেন । ১৯২০ সালের অক্টোবরে তাসখন্দে প্রতিষ্ঠিত হল ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি । তিরিশের দশকে শুরু হল বাংলায় মার্কস এর দর্শন ও লেলিন-এর রণকৌশল চর্চা (১৯৩১-১৯৩৫) । সেই সময়ে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদ করেন মার্ক্সের গ্রন্থ ‘কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্ট’ ‘সাধারণ স্বত্ববাদীর ইস্তাহার’ নামে । এর সমালোচনায় কল্লোল বলেছিল--

*‘‘এরূপ একখানি পুস্তক বাংলা ভাষায় প্রচারিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল, সৌমেন্দ্রনাথ সে অভাব মোচন করিয়াছেন । তিনি নিজে একজন সাধারণ স্বত্ববাদী, Proletariat বা ‘আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের’ উন্নতি কামনায় পৃথিবীব্যাপী যে শ্রমিক আন্দোলন চলিতেছে, তাহার ঘোষণাবানীর সহিত এ দেশের জনসাধারণের পরিচয় করাইয়া দেওয়াই তাঁহার উক্ত অনুবাদের উদ্দেশ্য ।’’*[২৫]

বিপ্লব-দর্শন ছাড়া আরও কিছু সমাজ-দর্শন সম্পর্কে সশ্রদ্ধ কৌতূহল তখন জাগতে শুরু করেছে । তাদের মধ্যে ফ্রয়েডীয় গবেষণা ও মনস্তত্ত্ব তরুণ দলের মনকে আকর্ষণ করলো সবচেয়ে বেশি । সেই মনস্তাত্ত্বিক আলোক-সম্পাতের ফলে স্বপ্নের আকাশ নতুন অর্থ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো; নারী-পুরুষ, জননী-সন্তান, দেহ-মন, প্রেম-কাম ইত্যাদি সম্পর্কে পুরনো ধারণাগুলি একেবারে পাল্টে গেল । প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালের তরুণ সমাজে ফ্রয়েডের চর্চা তাদের চৈতন্যের রাজ্যে আনল এক আলোড়ন । ঠিক সেই সময়ে ফরাসি, স্ক্যান্ডানেভিয়ান, নরোয়েজিয়ান, আইসল্যান্ডিক, স্প্যানিশ, ইতালিয়ান, জার্মান, পোলিশ, হাঙ্গেরিয়ান, রাশিয়ান ও জাপানিজ সাহিত্য ইংরেজি অনুবাদে বাংলার বাজারে সুলভ হয়ে উঠল । ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি বাঙালির বহুকালগত প্রভাব তো ছিলই, তার সঙ্গে যুক্ত হল কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের প্রভাব । তাত্ত্বিক দিক ছাড়াও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ তখন ছিল উত্তাল । ভারতবাসীর যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তার জন্য মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফর্মের (১৯১৯) দাক্ষিণ্য বিতরণ করা হল । এতে রাজনৈতিক অগ্রগতি কিছুটা হল বটে, কিন্তু জাতীয় আশা-আকাঙ্খার দিক থেকে তা নৈরাশ্যজনক বলে বিবেচিত হল । এই সময়েই জাতীয় চেতনায় একটা প্রচন্ড আঘাতের মত ঘটলো জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড (১৯১৯) । প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নাইট উপাধি ত্যাগ করলেন । ফলে সংবেদনশীল যুবকচিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো । তারপর খিলাফৎ আন্দোলনকে (১৯১৯-১৯২২) কৌশলে স্বীকার করে গান্ধীজী শুরু করলেন বৃহত্তর অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১) । স্ত্রী-পুরুষ, বেকার-চাকুরিজীবী, শ্রমিক-কৃষক ইত্যাদি জনসাংকর্ষের বিরাট অংশ ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই সর্বাত্মক রাজনৈতিক আয়োজনে । মোটকথা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকাল ছিল বাংলাদেশের পক্ষে মোড় ফেরার কাল-জীবনচর্যায় ও মানসিকতায় । আমাদের সংস্কৃতিতে যে পূর্ববাহিত গ্রামীণ সুর ছিল তাকে ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠল আধুনিক যুগের নাগরিক সুর, আমাদের বদ্ধ জন জীবনের প্রাঙ্গনে বিশ্বের স্রোত আরও বেশি অর্থবহরূপে এসে পৌঁছল । বাংলা সাহিত্যে এই পরিবর্তনের হাল ধরলেন কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকগণ যার অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিন জন- অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং বুদ্ধদেব বসু । কল্লোল-পরবর্তী যুগ বলতে যে সময়টাকে আমরা মূলত বুঝি, তার পূর্বসীমা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা এবং উত্তরসীমা স্বাধীনতা-প্রাপ্তি ও দেশবিভাগ । এই সময়টাতে যে সমস্ত বিপর্যয়কারী ঘটনা বিশেষ করে কলকাতার উপর দিয়ে ঘটে গেছে সেগুলো হল- জাপানী আক্রমণ (১৯৪১), আগস্ট আন্দোলন ও মেদিনীপুরে

বিধ্বংসী বন্যা (১৯৪২), পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩), দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় রণাঙ্গনে সমরায়জনের মঞ্চরূপে কলকাতা ও বাংলাকে ব্যবহার (১৯৪১-১৯৪৫), দাঙ্গা (১৯৪৬), আজাদ হিন্দ আন্দোলন (১৯৪৬-১৯৪৭), দেশবিভাগ, স্বাধীনতা-প্রাপ্তি ও উদ্বাস্তু আগমন (১৯৪৭-১৯৫০)। কলকাতা তথা বাংলার জনজীবনে এই দশ বছরে যে বিপর্যয় ঘটল পূর্ববর্তী এক শতাব্দীতেও তা ঘটে নি । এই দশ বছরে বাঙালির যেন জন্মান্তর হলো । শত প্রয়াসেও সে আর তিরিশের দশকের শান্তি, স্বস্তি ও মন্থরগতি জীবনে ফিরে যেতে পারল না । সঠিক অর্থে বললে এই দশটি বছর বাংলার সমাজ ও রাষ্ট্রে কালান্তরের পর্ব । মন্বন্তর, নিষ্প্রদীপ, বিমান হামলা, কন্ট্রোল, রেশনিং, মিলিটারী সাপ্লাই, যুদ্ধকালীন কলকাতার সমাজজীবনের অধোগতি, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, নৈতিক মূল্যবোধের বিনষ্টি, দাঙ্গা, স্বাধীনতা প্রাপ্তি, দেশবিভাগ ও উদ্বাস্তু-স্রোত এত সব ঘটনা ঘটে গিয়েছে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে । খুব সঙ্গত কারণেই সাহিত্য ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়েছে । শরৎচন্দ্রীয় রোমান্টিক যুগের অবসান ঘটল, কল্লোলীয় বোহেমীয় পালার অবসান ঘটল, সর্বপরি বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-মুগ্ধতারও অবসান ঘটল। এই পটভূমিতে এলেন তরুণ লেখকবৃন্দ যাদের সাহিত্য চেতনা উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই এই আলোড়িত বিপর্যস্ত যুগের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে গেছে । এই পর্বের সামাজিক বাতাবরণ অশান্ত এবং বিক্ষুব্ধ । এই বিপর্যয় তাঁদের দৃষ্টিকে করেছে কিছুটা ব্যাহত, তীক্ষ্ণ, আবিল আবার কখনও বা কিছুটা একপেশে । তরুণ লেখকগণ রক্তের চাপ মুছে, শবদেহ মাড়িয়ে, মানবিক মূল্যবোধ বিসর্জনের সাক্ষী থেকে আর্থিক বিপর্যয়ে ও দেশবিভাগের ধাক্কায় শেকল-ছেঁড়া নোঙড়হীন নৌকার মতো জগৎ ও জীবনকে, ব্যক্তি ও সমাজকে নতুন চোখে দেখেছেন । তাই সমসাময়িক লেখকদের সাহিত্য বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের অবশ্যই এই পটভূমির কথা স্মরণ রাখতে হবে । এই পর্বে যারাই কিছু লিখেছেন তাঁদের প্রায় সকলের সাহিত্যেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমসাময়িক ঘটনা উঠে এসেছে । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ও তাঁর ব্যতিক্রম নন । একজন সংবেদনশীল লেখক হওয়ার কারণে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ও এই বাস্তবতাকে এড়িয়ে যেতে পারেননি । তবে এতকিছুর মধ্যেও ওয়ালীউল্লাহ্কে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল দেশবিভাগ এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মত ন্যাক্কারজনক ঘটনা । কারণ তিনি ছিলেন এর প্রত্যক্ষদর্শী এবং ভুক্তভোগী । সৈয়দ আবুল মকসুদ-এর গ্রন্থ থেকে আমরা সে ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারি--

*'ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনের সবচেয়ে সংকটের সময়টি ছিলো পার্টিশনের সময়ের কলকাতার দাঙ্গা ।নসুরুল্লাহ ও তিনি দু'কামরার এক বাসা ভাড়া করে থাকতেন ।ছিলো সার্বক্ষণিক একটি কাজের লোক যে বাজার করা, রান্নাবান্না থেকে বাসার সকল কাজ করতো ।দাঙ্গা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে কাজের লোকটিকে বিদায় দিয়ে গ্রামে চলে যেতে বলেন ।বাইরের গেটে তালা দিয়ে তাঁরা দু'ভাই ঘরের ভেতরে অবরুদ্ধ থাকেন । এরমধ্যে দাঙ্গা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। প্রথম দু'একদিন যা পেরেছেন দুটো সিদ্ধ করে খান তারপর থেকে অভুক্ত । তিন দিন তিন রাত সম্পূর্ণ অনাহারে ছিলেন শুধু পানি পান করে । এরমধ্যে শওকত ওসমান এবং বুলবুল চৌধুরী তাঁর বাসায় গিয়ে দেখেন যে তাঁদের দু'ভাইয়ের প্রায় মরণাপন্ন অবস্থা ।বুলবুল চৌধুরী তখন থাকতেন কমরেড মোজাফফর আহমেদের তত্ত্বাবধানে লোয়ার সার্কুলার রোডে মুক্তাগাছার জমিদারের স্বল্পকালের জন্যে পরিত্যক্ত বাসভবনে । আরো অনেক বামপন্থী রাজনীতিক, কর্মী, লেখক-শিল্পী ওই মুহূর্তে সেখানে থাকতেন । এ সম্পর্কে একজন সাংবাদিক স্মৃতিচারণে লিখেছেন :*

*১৯৪৭ সালের এক দাঙ্গার পর মুক্তাগাছার মহারাজা শীতাংশু আচার্য চৌধুরীকে তাঁর লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়ী থেকে অল্পকালের জন্যে নিরাপদ এলাকায় সরে যেতে হয়েছিলো ।তাঁর বাড়ীটি ছিলো হিন্দু মুসলিম দু এলাকার সঙ্গমস্থলে । কিন্তু খালি বাড়ী পেলে স্কোয়াটাররা দখল নিতে পারে এ বিবেচনায় তাঁর ভাই ব্যারিস্টার স্নেহাংশু আচার্য চৌধুরী কাকা বাবুকে ।কমরেড মোজাফফর আহমদ৷ তাঁর মুসলমান বন্ধুবান্ধব নিয়ে সে বাড়ীতে বিনা ভাড়ায় থাকতে অনুরোধ করলেন যতদিন না তাঁর ভাই ফিরে আসেন ।*

*প্রকান্ড দোতলা বাড়ী । তা ছাড়া কর্মচারীদের জন্যে একটি দোতলা আউট হাউস, কয়েকটি গাড়ীর গ্যারেজ ও তার ওপর ড্রাইভারদের থাকার ঘর । সেখানে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে আমিও গিয়ে উঠলাম । ওপর নিচ দু'তলাতেই মাঝখানে বিশাল হলঘর আর তার চারপাশে শোবার ঘর । নিচতলায় এক ঘরে বুলবুল চৌধুরী, সস্ত্রীক মনসুর হাবিব (পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্পিকার ও মন্ত্রী), এক ঘরে কবি গোলাম কুদ্দুস, আমানুল্লাহ সৈয়দ (মনসুর হাবিবের ছোট ভাই) ও আমি । গাড়ী বারান্দার ওপর আব্দুল হালিম ও তাঁর স্ত্রী অশ্রু হালিম। ওপর তলায় আরও দুটি পরিবার ছিলেন তাদের নাম মনে করতে পারছি না । আউট হাউসের উভয় তলায় পাঁচ ছয়টি পরিবার থাকতেন তার মধ্যে কেবল ইসরায়েল ভাই, গরিমা ভাবীর কথা মনে আছে।'*[২৬]

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের কিছুকাল পরে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যখন স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের সহকারী বার্তা সম্পাদক হয়ে ঢাকায় আসেন তার কিছুকাল পরেই রচনা করেন দেশ-ভাগ নিয়ে তাঁর অবিস্মরণীয় ছোটগল্প 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাংলা ভাষায় দেশবিভাগ নিয়ে তেমন স্মরণীয় সাহিত্য উপন্যাস বিভাগে অন্তত রচিত হয়নি । খুব সম্ভবত এ বিষয়ে একটা দ্বিধা দ্বন্দ্বের জড়তাই লেখকদের একটা বড় অংশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল । তবু তার মধ্যে যেটুকু লেখা পাওয়া যায় তার বেশির ভাগটাই তৈরি হয়েছিল সাময়িক চাহিদাপূরণের তাগিদ থেকে । ফলত সেই সব লেখায় প্রত্যক্ষ ঘটনার কিছু লেখচিত্র ছাড়া আর বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না । আমরা এই কথা বলতে পারি নবেন্দু ঘোষের 'ফিয়ার্স লেন'(১৯৪৬) বা অমরেন্দ্র ঘোষের 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে'-র (১৯৫১) মত রচনাকে সামনে রেখে ।এর মধ্যেও পরিস্থিতির আঁচ কিছুটা ছুঁতে পেরেছিল কিছু রচনা । যেমন-অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড় শ্রীখন্ড' (উ.১৯৫৭) অথবা জীবনানন্দ দাশের 'জলপাইহাটি' (১৯৪৮) প্রভৃতি উপন্যাস । কিন্তু সেখানেও বিভেদ -বিচ্ছেদের প্রসঙ্গটি এসেছে হয় উপকাহিনির আকারে, নয়তো স্বতন্ত্র একটি কাহিনির আড়ালে প্রচ্ছন্ন থেকে । সতীনাথ ভাদুড়ীর 'গণনায়ক' (ছো.গ.১৯৪৭) আর জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' ছাড়া এই পর্বের আর কোন রচনাকেই বোধহয় সার্থক আর প্রতিনিধিস্থানীয় বলা যায় না ।

তবে উপন্যাসে সূক্ষ্মতার ছাপ পরবর্তী যুগের বেশ কিছু রচনায় আমরা পেয়ে থাকি। বিশেষ করে শহীদুল্লা কায়সারের সংশপ্তক (উ.১৯৬৫), প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়া পাতার নৌকা' (উ.১৯৬৯-১৯৭০), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' (উ.১৯৭১), শঙ্খ ঘোষের 'সুপুরিবনের সারি' (উ.১৯৯০), শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জীবন রহস্য' (উ.১৯৯২) এবং অবশ্যই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা' (উ.১৯৯৬) কিন্তু এক্ষেত্রেও প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়া পাতার নৌকা' ছাড়া আর কোন উপন্যাসেরই কেন্দ্রীয় বিষয় দেশভাগ নয় । উপন্যাসে প্রসঙ্গটি এসেছে হয় কালিক এবং স্থানিক প্রয়োজনে; নয়তো একটি স্বতন্ত্র মূল-কাহিনির সমাপ্তিপর্ব হিসেবে । সেক্ষেত্রে দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে যেন লেখকের জীবনের একটি অধ্যায়ও শেষ হয়ে গেছে । আখ্যানকে সেই ঐতিহাসিক ঘটনার স্থানকালে গেঁথে নিয়ে লেখক যেন তাঁর জীবনকাহিনির একটি পর্বের সমাপ্তিকেই কালচিহ্নিত করে দিয়েছেন। তবু সমকালীন রাজনীতির টানাপোড়েনের নক্‌শাটি শহীদুল্লা কায়সার, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশেষ করে

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস যে-ভাবে বুনে রেখেছেন, তা আমাদের অভাব কিছুটা পূরণ করেছে বলতে হবে । শহীদুল্লা কায়সারের বর্ণনায় আমরা দেশভাগের যন্ত্রনার পাশাপাশি বিভাগোত্তর সময়ের কথাও পাই । যা আমাদের হৃদয়ের ভিত্তি স্তম্ভকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়--

*''যুদ্ধের কন্ট্রাক্টর, জঙ্গী বাহিনীর মাল-মশলার যোগানদার, নাম তার শেখ রমজান । যুদ্ধের পর এল পাকিস্তান ।*

*পাকিস্তানের মওকাও ছাড়ে নি রমজান ।*

*আজ বুঝি আরও উঁচু স্তরের মানুষ শেখ রমজান । আজ তার কোন্ পদবী, তালতলির কোন্ কাজিবাড়িতে তার নতুন মসনদ ! জানে না মালু । ওলট পালট, লয় পরিবর্তন, এটাই নাকি পৃথিবীর নিয়ম । সে নিয়মেরও ধর্ম আছে । সে পরিবর্তনের ধর্ম, তার গতি, সময় ও কালের ফলকচিহ্নে দৃষ্টিগ্রাহ্য ।*

*কিন্তু রমজান ? ও যেন ভোজবাজি, ছুমন্তর । পীর সাহেবের ফুঁক ফাঁক তুক তাক, কুদরতের ভেল্কিবাজি । লোকে বলে সেই ভেল্কিবাজিতে একখানা নোট দশখানা হয়, দেখতে এক টাকার নোটখানা হয়ে যায় একশো টাকার ।*

*ম্যাজিকের ওই ভেল্কিবাজিকেও যেন হার মানিয়েছে রমজান । ছাড়িয়ে গেল সময়ের গতিকেও। উল্টিয়ে দিয়েছে নিয়মের চাকা ।*

.....

*কম জ্বালিয়েছে, কম জ্বালাচ্ছে ওই লোকটা ? উৎখাত করেছে গোটা বাকুলিয়া । তাতেও কি তার তিয়াষ মিটেছে ? মাত্র দুদিনের মাঝে ফাঁকা হয়ে গেল অতবড় তালতলি । সোনাদানা জায় জেয়র যতটুকু সম্ভব সঙ্গে নিয়ে গেছে, কিন্তু জোত-জমি, বাড়ি-ঘর তো আর হাঁটতে পারে না ? বোঁচকা বেঁধে নিয়ে যাবার জিনিসও নয়, সে সব তো রয়েই গেল । ধর্ম না হয় আলাদা, তাই বলে কি ওরা মানুষ নয় ? ওরা এ দেশের মাটির সন্তান নয় ? হাজার বছর সুখে-দুঃখে এক সাথে থাকিস নি ? আর সেই মানুষগুলির দুর্দশার সুযোগ নিয়ে এমন বেঈমানি করলি তুই ? লাখ লাখ টাকার আমানত স্রেফ জবত করে নিলি ?*

*শুধু কি তাই ? চশমখোর বেঈমানের কি জাত আছে, না ধর্ম আছে । ফেলু মিঞার তেল নুন খেয়ে তুই মানুষ । হোক হারামের রুজি, তবু রামদয়ালের কৃপাতেই তো দুটো পয়সা করলি তুই । আর তাদের রেহাই দিলি না ? এমন নিমকহারামির কথা কেউ শুনেছে কখনো?*

*রাণুদির বাড়িতে কি কেউ নেই । কথার মাঝখানেই শুধাল মালু ।বাধা পেয়ে বিরক্ত হল সেকেন্দার । ভেংচি কেটে বলল : আর রাণুদি, বলছি কি এতক্ষণ ! গোটা তালতলিতে ঘুঘু চরছে । দত্তবাড়িতে সাদ্দাদি বালাখানা খুলেছে রমজান, কাজি মোহাম্মদ রমজান । মিত্তির বাড়িতে দিব্যি গুছিয়ে বসেছেন আমার গুণধর ভ্রাতা সুলতান মিঞা । ভট্চার্যি বাড়িতে মিঞার পেয়াদা কালু এখন কালু শেখ ।*

*ও, তা হলে দত্তবাড়িটাই রমজানের কাজিবাড়ি । আমি তো এতক্ষন ভেবে সারা, তালতলিতে আবার কাজিবাড়ি এল কোথা থেকে । করুণ রসেও বুঝি হাসি পায় মানুষের । আসলে সেটা কান্নারই আর এক রূপ । তেমনি একটি হাসি পেল মালুর । রমজান যেন মর্মান্তিক, করুণ কোন নাটকের নায়ক । তাকে ঘিরে যেন ইতিহাসের প্রহসন । কিন্তু ফেলু মিঞা ? চোখের কোলে প্রশ্ন আঁকল মালু ।*

*রমজানের বাপদাদারা ছিল মিঞাদের গোলাম । সেই গোলামজাতের রাজত্বে বাস করবে মিঞারা? তাই ফেলু মিঞা চলে গেছে শ্বশুরবাড়ি । সেখানে থাকে এখন । ঘরজামাই । সুখেই আছে ।*

*সত্যি কি সুখে আছে ? নিজেকেই যেন শুধাল মালু । সেই কবে দেখা গাবতলায় দাঁড়ান পরাজিত ফেলু মিঞার উদাস দৃষ্টিটা, আজও যেন স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল মালুর চোখের সম্মুখে ।*

*বেচারা ফেলু মিঞা । পারল না লুপ্ত গৌরবের এক কণা ফিরিয়ে আনতে ।*

*না পারল নতুন জীবনে খাপ খাওয়াতে ।*

*বুঝি এমনি অদ্ভুত আর নির্মম জীবনের ধর্ম । কাউকে ক্ষমা করে না সে । রেহাই দেয় নি ফেলু মিঞাকে ।*

*ফেলু মিঞার কথা থাক, অন্যদের কথা বলুন না মাস্টার সাহেব ? হ্যাঁ, সবার কথা বলবে সে। বলার জন্য, শুধু বলার জন্যই তো এখনো বেঁচে আছে সেকান্দর মাস্টার ।*

*রাবু আপা কেমন আছে ?*

*ভাল । সংক্ষেপে বলে আবার রমজানের প্রসঙ্গেই ফিরে এল সেকান্দর । কথায় কথায় ছোট হয়ে আসে পথ । ট্রাংক রোড ছেড়ে ওরা নেবে এল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় । যে রাস্তাটা তালতলির আর দত্তের বাজার হয়ে বড় খাল ডিঙিয়ে সোজা চলে গেছিল বাকুলিয়ায় ।*

*তালতলির তালের সারি । তেমনি উন্নত শির । সজাগ প্রহরী । কাঁঠালিচাঁপার গন্ধে ভুর ভুর বাতাস, দৌড়ে এসে যেন জড়িয়ে ধরল চেনামানুষ মালুকে । গাছ গাছালির ছায়া ঢাকা পথ, যেমনটি ছিল আগে ।*

*তবু কি তেমনি আছে তালতলি ?*

*জন নেই, মানুষ নেই, কোথাও এতটুকু কোলাহল নেই । বড় বড় দালানগুলো দাঁড়িয়ে আছে বসতিহীন শ্রীহীন শোভাহীন । যেন প্রাগৈতিহাসিক কংকালের সারি । সভ্যতার কোন লুপ্ত যুগের স্মারক। কি এক শূন্যতায় খা খা করছে তালতলি । শ্মশানের দীর্ঘশ্বাসের মতো কি এক হাহাকার তালতলির মাটির বুকে ।*

*স্কুলের জাঁদরেল পন্ডিত ভট্চার্যি মশায় । তাঁর নাতির ছিল বাগানের শখ । শৌখিন শহুরের অনুকরণে বাড়ির সুমুখে সাজিয়েছিল দেশি-বিদেশি ফুলের কেয়ারি । সৌন্দর্যের সেই কোমলকঁড়িদের গ্রাস করেছে আগাছার জঙ্গল ।*

*মিত্তিরবাড়ির ডাঙা ছাড়িয়ে দক্ষিণে ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তা ঘেঁষে চাঁপাতলা । ছেলেমেয়েদের ফুল কুড়ানো আর খেলার জায়গা । কত দিন রাণুর জন্য মালু ফুল কুড়িয়েছে এই চাঁপাতলায় ।*

*চাঁপাতলায় আজ কেমন গা ছম ছম ভয় ।সেই কবে থেকে চাঁপা কলিরা ঝরে চলেছে। ঝরে ঝরে শুকিয়ে গেছে । গালের উপর শুকিয়ে যাওয়া কান্নার দাগের মতো কত দাগ কেটে গেছে মাটির গায়ে । কেউ তার খোঁজ রাখে নি । কেউ আর আসে না ফুল কুড়াতে । আঁচল ভরে তুলে নেয় না । মালা গাঁথে না ।*

*নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে চায় না মালু । বিশ্বাস করতে চায় না সেদিনের সেই ছবির মতো সুন্দর কোলাহলমুখর তালতলির এই ভুতুড়ে স্তব্ধতা ।*

*হয়ত ছবির মতো সুন্দর ছিল না তালতলি । শ্রীহীন বাকুলিয়ার তুলনায় শ্রীময় মনে হত তালতলিকে ।*

*চোখের সুমুখে উঠে আসে পরিচিত মুখগুলো ।ভেসে উঠে ওদের স্বচ্ছল পরিচ্ছন্ন জীবনের ছবিটা । ওদের বিলাস, ওদের অর্থ, মর্যাদা, শক্তি ।ওদের ক্ষুদ্রতা, ওদের মহত্ত্ব । একদা যারা ছিল তালতলির নামের আকর্ষণ । সম্ভ্রম, হয়ত ভীতিও ।*

*ছিন্নমূল সেই মানুষগুলো ।কোথায় কোন্ দেশের মৃত্তিকাহীন জীবনে বেঁচে আছে তারা, কে জানে! রানুর মতো হয়ত অনেকেই হারিয়ে গেছে নিষ্ঠুর কোন মৃত্যুর ওপারে ।*

*ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস কেঁপে কেঁপে বেরিয়ে এল মালুর বুক চিরে । বেরিয়ে এসে মিলিয়ে গেল তালতলির হাহাকার।*

*দেখতে দেখতে কি যেন হয়ে গেল । দরবেশ চাচা বলে, সবই মাদারির খেল-সচকিত হল মালু । সেই যে বলতে শুরু করেছে সেকান্দর মাস্টার এখনো বলেই চলেছে ।*

*দরবেশ চাচাই ঠিক । সবই ভেল্কিবাজি । মাদারির খেল । আবারও বলল সেকান্দর মাস্টার । তাই কি ? মূঢ় নির্বোধ ওই আকাশটাকে যেন শুধাল মালু । এ কি বধির কোনো বিধাতার অভিশাপ ? অথবা জীবনেরই কোনো নির্মম ধারা । সঠিক জবাবটা কেউ দিতে পারে কি?*

.....

*মিত্তিরবাড়ির পেছনে যুগীপাড়ার রাস্তার লাগোয়া প্রকান্ড পুকুর । পুকুরের উত্তর পাড় ধরে বড় মাঠ । পুকুরের পাড়ে আর ওই মাঠে মেলা বসত দোলের সময়, চৈত্র সংক্রান্তিতে । ছোট বেলায় জাহেদের সাথে রাবু আরিফা মিলে কতবার এই মেলায় এসেছে । কত কিছু কিনত ওরা । রাবু আরিফা পর্দা নেয়ার পর মালু একাই আসত ওদের ফরমাশ নিয়ে । তারপর এই মেলা থেকেই তো বিভাকে একটা মাটির নটরাজ কিনে দিয়েছিল মালু । লাজুক নয় বিভা, এটা সবাই জানতো । কিন্তু সেদিন বিভার -শ্যামলা মুখখানা কি এক লজ্জায় আনত হয়েছিল। বিভা বলেছিল তুমি কেন এত কিছু দাও আমাকে ?.*

.....

*বিভা নেই । আরতি, সুলেখা, বিনোদ, হরিহর ওরা কেউ নেই । এখন আর মেলা বসে না এখানে। যারা মেলা বসাতো তারা নেই । পুকুরের পাড়গুলো কে বা কারা কেটে ফেলেছে, ক্ষেত বানিয়েছে । মাঠটাও নেই। সেখানে এখন ধানের ক্ষেত । ভাবতেও কেমন লাগে মালুর। তালতলিতে বিভাকে আর দেখা যাবে না কখনও । এ গ্রামে আর কেউ অশোকের গান শুনবে না কোনোদিন । রানুদের বাড়িতে আর কখনও ডাক পড়বে না মালুর ।*

*ছোটবেলার মতো দুচোখ ছাপিয়ে কান্না এল মালুর। অন্ধ অভিমানে রাগে ক্ষোভে অপমানে। ছোটবেলায় যেমন করে কাঁদত মালু । মালুর মনে পড়ল, বাকুলিয়া তালতলি ছাড়ার পর এই প্রথম দুচোখ ভাসিয়া কাঁদল ও ।'*[২৭]

উপন্যাস সাহিত্যে আরো যে কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করতে হয় সেগুলো হল-- সমরেশ বসুর 'সওদাগর', গৌরকিশোর ঘোষের 'দেশ মাটি মানুষ' এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্বপশ্চিম'। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বলতে হয়-ঋত্বিক ঘটকের 'সড়ক', আবু রুশদের

'নোঙর', বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'স্বরাজ-রেলে', 'কলকাতা-নোয়াখালি-বিহার', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'গণনায়ক', দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটায়ু' এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পালঙ্ক' গল্পের কথা । এক একজন লেখক একেক রকম দৃষ্টিতে দেশভাগকে দেখেছেন । সতীনাথ ভাদুড়ীর 'গণনায়ক' গল্পে দেখি মুনাফাবাজেরা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাকে পণ্য করে সেই দুঃসময়ে নাগরনদীর এপার ওপার দুদিক থেকে সাধারণ মানুষের উৎকণ্ঠা ভাঙিয়ে পকেট ভারি করছেন । বিপন্ন উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ জনের 'উপকার' করার জন্য মুনিমজী তাদের সব চাল কিনে নেন ষোল টাকা দরে । এর মধ্যে হিন্দু মুসলমান চোরা কারবারিদের গোপন যোগসাজস চলছে। পাকিস্তানে পড়েছে শুনে আতঙ্কগ্রস্ত নরনারী নাগরনদীর পুল পার হয়ে শ্রীপুরের দিক থেকে চলে আসছে দলে দলে -ছেলে মেয়ে গরু ছাগল । হাড় জিরজিরে কালাজ্বরের রোগী চলেছে বিড়াল কোলে নিয়ে । কাশতে কাশতে চলেছে হেঁপো বুড়ি-পাকিস্তান থেকে বাঁচতে গিয়ে প্রাণটা বেরোয় বুঝি । দর্পণ সিং-এর স্ত্রী আপন মনে বকে চলে- 'লকলকে কুমড়ো গাছটা থেকে প্রাণে ধরে এক দিন একটা ডগা, ডাঁটা খাওয়ার জন্য কাটতে পারিনি ।সেটাকে দিয়ে এলাম গোড়া থেকে কেটে বঁটি দিয়ে । বলদ জোড়াও ভয় পেয়েছিল নাকি, কুমড়োর ডগা এগিয়ে দিতে শুঁকে মুখ ফিরিয়ে নিল । চ্যালা কাঠ দিয়ে আসবার সময় উনুনটা ভেঙে দিয়ে এলাম । কি সুন্দর করে ঝকঝকে তকতকে উনুনটা তুলেছিলাম তাতে রাঁধবে কিনা এরফানের চাচী !' অথচ গল্পেই আমরা দেখি পাকিস্তানী আবেগের মধ্যেও এরফানের মানবিক সহৃদয়তা। মুনিমজীর কোনো চোখের চামড়া নেই-গল্পে পতাকা বিক্রির ঘটনায় বোঝা যায় মুনিমজী ভারতীয়ও নন, পাকিস্তানীও নন-তাঁর রাষ্ট্রীয় সীমানা নিরপেক্ষ পরিচয় একটাই-তিনি চোরাকারবারী, পাচারকারী । গান্ধী টুপিটা মাথায় পরবেন কিনা এ নিয়ে তাঁর সংশয় বড় মজার।

ছোটগল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটায়ু' গল্পটির কথা বাদ দিলে আলোচনাটি একান্তভাবেই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । দীপেন্দ্রনাথের লেখায় মিথের প্রয়োগ একাধিক সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । তিনি তাঁর লেখায় মিথকে নানাভাবে ব্যবহার করেন । তেমনি 'জটায়ু' গল্পে ছিন্নবাহু নেত্যচরণের নৃত্যের মাধ্যমে রামায়ণের এক বিপন্ন মুহূর্তের স্মৃতি ভেসে ওঠে । দেশভাগ, ঘাতক, অগ্নিকান্ড-দুর্গার স্মৃতিকে আলোড়িত করে নেত্যচরণের ছিন্নবাহু অবস্থায় ধুনুচিনাচ দেখতে দেখতে । গল্পটির বিশিষ্টতা এখানে যে জটায়ুর পৌরাণিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও যে অদম্যতা তাই যেন সঞ্চারিত হয়েছে নেত্যচরণে । উদ্বাস্তুদের

নিয়ে দুঃখবিলাস নয়-বরং জটায়ুর লড়াই আর নেত্যচরণদের কঠিন ক্রোধ, আত্ম-সমালোচনা, সব মিলিয়ে সত্যই মনে হয় রামায়ণের সেই বীর বিহঙ্গ বুঝি মূর্ত হয়ে উঠেছে । সীতার জন্য সংগ্রাম আর দুর্গার জন্য নেত্যচরণের আবেগ এখানে একীভূত । আমার কাছে তাই ভিটেহারা নেত্যচরণ আর ডানাছেঁড়া জটায়ু এক ভূমিকায় আর্ত অথচ অদম্য ।

তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় উপন্যাস এবং ছোটগল্পের তুলনায় দেশভাগের চিত্র অঙ্কনে নাট্যকাররা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন । আলাদা করে বলতেই হয় দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা', 'নয়া শিবির', ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল', 'সাঁকো', বিজন ভট্টাচার্যের 'গোত্রান্তর', তুলসী লাহিড়ীর 'বাংলার মাটি', 'লক্ষীপ্রিয়ার সংসার' এবং সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী'-র কথা । বলতে দ্বিধা নেই এদের মধ্যে সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' ভারে এবং ধারে শ্রেষ্ঠ রচনা । নবনাট্য আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত 'নতুন ইহুদী'-র বিষয়বস্তু ছিল স্বতন্ত্র, সমকালীন অত্যন্ত জোরালো বিষয় নিয়ে তিনি এই বিতর্কিত ও শক্তিশালী নাটকটি লিখেছিলেন । দেশবিভাগ মানুষের জীবনে এক ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে এসেছিল । শিয়ালদা স্টেশনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ থেকে রেলগাড়ির পর রেলগাড়ি এসে ঢেলে দিচ্ছে উদ্বাস্তু মানুষ ।শিয়ালদা স্টেশনকে এক তথ্যনিষ্ঠ গবেষক প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী নাম দিয়েছিলেন 'শিয়ালদা স্টেশন : দি গেট ওয়ে টু হেল' । ৩৬ x ৩৯ মাপের অতীব সংকীর্ণ একটা পরিসরে-- এই অনভ্যর্থিত অবাঞ্ছিত জনপুঞ্জ উদ্বাস্তু শিবিরে চালান হয়ে যাবার আগে জড় হত । এরা আহূত ? না । রবাহূত ? তাও না । সম্পূর্ণ অনাহূত । দিল্লিতে সমাসীন আমাদের সরকার ছিন্নমূল পাঞ্জাবীদের সম্বন্ধে যা বললেন না, 'বাঙাল' উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে সেটাই বললেন-- এরা ফরেনার । সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী' নাটকের নামকরণের উৎস এখানেই লুকিয়ে আছে । তাঁর ভাষায়--

*''উত্তর সারথি গোষ্ঠীর জন্যেই লিখলাম 'নতুন ইহুদী' নাটকটা । ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের সমস্যা বেদনা নিয়ে এই নাটক । নামটা ইচ্ছা করে 'নতুন ইহুদী' রেখেছিলাম । কিছুটা প্রতীকী। হিটলারের অত্যাচারে যেমন জার্মানি থেকে ইহুদীদের উদ্বাস্তু হতে হয়েছিল ঠিক সেরকমই অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হয় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের । তাই নাটকের নাম 'নতুন ইহুদী' ।''*[২৮]

দেশবিভাগের ফলে ছিন্নমূল, বাস্তুহীন মানুষগুলির বেঁচে থাকার লড়াই, দুর্দশা বিভিন্নভাবে নাট্যকার স্বল্পপরিসরে সংক্ষিপ্তভাবে দেখিয়েছেন যার ফলে মূল বক্তব্যটি অত্যন্ত

জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । অবস্থার প্রেক্ষিতে একেকটি চরিত্রের জীবনসংগ্রাম একেকটি মাত্রা পেয়েছে । খুব স্বাভাবিকভাবে নাট্যকার 'নতুন ইহুদী'-কে ঠিক কোন ভাবনায় অলঙ্কৃত করতে চেয়েছেন তা অস্পষ্ট থাকে না । গ্রামের চাষী কেষ্টদাস বসত ছেড়ে সস্ত্রীক কলকাতায় এসেছিল মনমোহন ভট্টাচার্যের পরিবারের সঙ্গে । দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে অন্নপূর্ণা আক্ষেপ করছেন, কেষ্ট তিনশ টাকায় দু'কাঠা জমি কিনছে, তাঁদের না জানিয়ে লুকিয়ে । কিন্তু পরে দেখা যায় সে প্রতারকের পাল্লায় পরেছে । তার কষ্টার্জিত তিনশ টাকা সস্তায় জমির লোভ দেখিয়ে আত্মসাৎ করা হয়েছে । ঘরের স্বপ্নে হিতাহিত-বুদ্ধি হারানোর অনিবার্যতা যেমন এখানে রয়েছে তেমনি রয়েছে পায়ের নীচের জমি শক্ত করার আশায় মানুষের আগ্রাসী এবং স্বার্থপর হওয়ার চিত্র । জীবনের সব কিছুর উর্দ্ধে বাঁচাটাই আসল কথা । জাতচাষী কেষ্টদাস শেষ পর্যন্ত চাষের জমি না পেয়ে কুলির কাজ করে, তার স্ত্রী করে পরিচারিকার কাজ ।

নাটকে আমরা কেষ্টদাসের খেটে খাওয়া পরিণাম দেখি, দুইখ্যার শোচনীয় উপসংহার আর পরীর গৃহত্যাগ । দুইখ্যা চুরি করতে শুরু করে, মোহন মুটেগিরি ।একই দুর্দশার অংশীদার দুই ভাই দু'ভাবে । একজন অপরিচ্ছন্ন পথে বাঁচার স্বপ্ন দেখে, অন্য জনের দাঁত চেপে লড়াই নিঃশর্ত প্রয়াসে । দুইখ্যা ট্রামে চাপা পড়ে, অন্নপূর্ণা হাতের লোহা খুলে দেন স্বামীপুত্রের চিকিৎসার জন্য । অজ্ঞতাহেতু বিনা লাইসেন্সে মাল বিক্রি করতে গিয়ে হাজতবাস করেছে মোহন । পরী যতীনের প্রস্তাব মেনে নিয়েছে ।হাসপাতালে দুইখ্যার মৃত্যু হয়েছে । মনোমোহন ভট্টাচার্যও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন । মনোমোহন ভট্টাচার্য তাঁর সম্মানবোধ, সতেজ নীতিজ্ঞান নিয়ে মানিয়ে নিতে পারেননি পরিবেশের সঙ্গে । ভগ্ন মন তাঁকে বাঁচতে দেয়নি । পরাজয় বা লড়াই-এর প্রশ্ন এই চরিত্রের ক্ষেত্রে একেবারে অবান্তর বরং তাকে একটি গতায়ু কালের সঙ্গে তুলনা করাই শ্রেয় । নাটকটির আসল বক্তব্য মোহনকে ঘিরেই; আগামী দিনের মৃণাল তো এরাই । আশার পদ্ম এরাই ফুটিয়ে তুলবে । তার বড় ভাই দেশের জন্য কারারুদ্ধ হয়েছিল, মৃত্যুও হয় তাঁর । সেই দেশ তাদের কি দিয়েছে ? মোহন প্রথমে প্রতিশোধ নিতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত বন্ধু মহেন্দ্রর প্রভাবে উজ্জীবিত হয়েছে । নাটকের শেষে রাজনৈতিক কর্মী মহেন্দ্রের চরিত্রটির মাধ্যমেই জোরালো বক্তব্যটি শ্রুত হয়--

*''মোহন : এই দুর্গতির মধ্যে কেন মায়রে বাঁচাইয়া রাখুম কইতে পারেন ? ওঁর আর বাঁচাইতে চাই না, আমিও মরতে চাই । কিন্তু মরণের আগে, একবার প্রতিশোধ নিতে চাই। ওগ খুন কইরা, ওগ ঘর জ্বালাইয়া দিয়া তারপর মরতে চাই । আমার বাবা নাই, ভাই নাই,*

*বইন নাই, আমর মা অর্ধমৃতা, আমি চাইনা, আমি চাইনা বাঁচতে । কার লেইগা, কিসের লেইগা বাঁচুম কইতে পারেন ?*

*মহেন্দ্র : বাঁচতে হবে তোমার নিজের জন্যে । তোমার মারে বাঁচাতে হবে তোমার জন্যে। তোমার মত নিরুপায় ভাগ্যের হাতে বন্দী হতভাগ্যদের বাঁচাবার জন্যই তোমায় বাঁচতে হবে । তাঁদের প্রত্যেকের দরজায় দরজায় ঘুরে তোমার দুঃখের কাহিনী শোনাতে হবে, আর ভাগ্যের বিরুদ্ধে, নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে, অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে, হৃদয়হীন শোষকদের বিরুদ্ধে, তোমাদের দাবীকে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ।*

.....

*তোমার ভাই দুইখ্যা মারা গেছে, কিন্তু যে কারণে সে মারা গেছে সে কারণ বর্ত্তমান । যে কারণে তোমার বোন গৃহত্যাগিণী, তোমার বাবার মৃত্যু ? তোমার মা অর্ধমৃতা-সে সব কারণই বর্ত্তমান । তারা মরে গেলেও কারণগুলো থেকেই গেল । আর রেখে গেল তোমাকে তার কৈফিয়ৎ নিতে । একই কারণে তোমার নিজের ভবিষ্যৎ আজ অন্ধকার, আর তুমি ভাগ্যের দাস। যদি এ নাগপাস থেকে মুক্তি চাও, মাকে ডাক, মাকে বাঁচাও । শিখে নাও কেমন করে মা তোমার দাদার মৃত্যুশোক .....সহ্য করেও তোমাদের মানুষ করেছেন । তোমার দাদার উত্তর-সাধকরূপে সে মন্ত্র শিখে নাও । মাকে ডাক, মাকে বাঁচাও । আর মনে মনে সমস্ত প্রপীড়িতদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শপথ নাও যে স্বার্থলোভী, অর্থলোলুপ যারা তোমাদের ভাগ্যকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, তাদের শাস্তি দেবে । হৃদয়হীন শোষকদের অত্যাচার তুমি খতম করবেই, ভাগ্যের গোলামী তুমি আর বরদাস্ত করবে না কিছুতেই ।'*[২৯]

দেশবিভাগ নিয়ে রচিত সাহিত্যের এই ধারায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' এক প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সমাজচেতনার এক দীপ্ত সাক্ষর এই গল্প । গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে 'নয়া-সড়ক' নামে এক সাহিত্য পত্রিকায় ১৯৪৮ সালে । গল্পের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে কলকাতা থেকে আসা উদ্বাস্তু মতিন, কাদের, মোদাব্বের, ইউনুস এবং এনায়েতদের এক পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়িকে দখল করা নিয়ে । দেশভাগের কারণে কলকাতা থেকে পূর্ববঙ্গে যারা এসেছে তাদের অনেকেই ইতিপূর্বে কলকাতার ব্লকম্যান লেন-এ খালাসি পট্টিতে, বেঠকখানায় দফতরির পাড়ায়, সৈয়দ সালেহ লেন-এ তামাক ব্যাবসায়ীদের সঙ্গে বা কমরু খানসামা লেন-এ অকথ্য দুর্গন্ধ নোংরার মধ্যে

দিন কাটিয়েছে । দেশভাগের হুজুগে পূর্ববঙ্গে এসে যখন তারা যেমন- তেমন একটা ডেরার সন্ধানে উদয়াস্ত ঘুরছে তখন তাদের চোখে পড়ে একটি বাড়ি--

*''ধনুকের মতো বাঁকা কংক্রিটের পুলটির পরেই বাড়িটা । দোতলা, উঁচু এবং প্রকান্ড বাড়ি । তবে রাস্তা থেকেই সরাসরি দন্ডায়মান । এদেশে ফুটপাত নাই বলে বাড়িটারও একটু জমি ছাড়ার ভদ্রতার বালাই নাই । তবে সেটা কিন্তু বাইরের চেহারা । কারণ, পেছনে অনেক জায়গা । প্রথমত প্রশস্ত উঠান । তারপর পায়খানা-গোসলখানার পরে আম-জাম-কাঁঠালগাছে ভরা জঙ্গলের মতো জায়গা । সেখানে কড়া সূর্যালোকেও সূর্যাস্তের ম্লান অন্ধকার এবং আগাছা আবৃত মাটিতে ভ্যাপসা গন্ধ ।.....*

*বাড়িটা তারা দখল করেছে । অবশ্য লড়াই না করেই; তাদের সামরিক শক্তি অনুমান করে বাড়ির মালিক যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল তা নয় ।.....সদর দরজায় মস্ত তালা, কিন্তু সামান্য পর্যবেক্ষণের পর বুঝতে পারে বাড়িতে জনমানব নাই এবং তার মালিক দেশপলাতক। পরিত্যক্ত বাড়ি চিনতে দেরি হয় না । কিন্তু এমন বাড়ি পাওয়া নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা । সৌভাগ্যের আকস্মিক আবির্ভাবে প্রথমে তাদের মনে ভয়ই উপস্থিত হয় । অবশ্য সে-ভয় কাটতে দেরি হয় না । সে-দিন সন্ধ্যায় তারা সদলবলে এসে দরজার তালা ভেঙে রৈ-রৈ আওয়াজ তুলে বাড়িটায় প্রবেশ করে । তাদের মধ্যে তখন বৈশাখের আম-কুড়ানো ক্ষিপ্র উন্মাদনা বলে ব্যাপারটা তাদের কাছে দিন-দুপুরে ডাকাতির মতো মনে হয় না । কোনো অপরাধের চেতনা যদি-বা মনে জাগার প্রয়াস পায় তা বিজয়ের উল্লাসে নিমেষে তুলোধুনো হয়ে উড়ে যায় ।''*[৩০]

এত গেল বাড়ি দখলের ইতিহাস । যে স্বল্পশিক্ষিত কেরাণীকুল বাড়িটি দখল করেছে তারা ইতিপূর্বে এত বড় বাড়িতে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেনি । ফলে খোলামেলা ঝরঝরে তকতকে এ-বাড়ি তাদের মধ্যে একটা নতুন জীবন সঞ্চার করে যেন । এ-বাড়ির বড় বড় কামরা, নীলকুঠি দালানের ফ্যাশানে মস্ত মস্ত জানালা, খোলামেলা উঠান,আরো পেছনে বনজঙ্গলের মতো আম-জাম-কাঁঠালের বাগান-এসব তাদের কাছে এক ভিন্ন দুনিয়া । এরা লাটবেলাটের মতো এক -একখানা ঘর দখল করেনি সত্যি, তবু এত আলো-বাতাসও তারা জীবনে কখনও উপভোগ করেনি । মনে আশার সঞ্চার হয় তাদের জীবনেও সবুজ তৃণ গজাবে, ধমনীতে সবল সতেজ রক্ত আসবে, হাজার-দু-হাজারওয়ালাদের মতো মুখে ধন-স্বাস্থ্যের জলুস আসবে, দেহও ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর-ক্ষয় ব্যাধিমুক্ত হবে । ইতিমধ্যেই রোগাপটকা

ইউনুসের মনে হয় তার স্বাস্থ্য ভাল হচ্ছে । কলকাতায় সে থাকত ম্যাকলিওড স্ট্রিটে । গলিটাকে তার মনে হত যেন সকালবেলার আবর্জনাভরা ডাস্টবিন । সে-গলিতেই নড়বড়ে ধরণের একটা কাঠের দোতলা বাড়িতে রান্নাঘরের পাশে স্যাঁতস্যাঁতে একটি কামরায় কচ্ছদেশীয় চামড়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চার বছর সে বাস করেছে । পাড়াটি চামড়ার উৎকট গন্ধে সর্বক্ষণ এমন ভরপুর হয়ে থাকত যে রাস্তার পচা দুর্গন্ধ নাকে পৌঁছত না, ঘরের কোণে ইঁদুর-বেড়াল মরে পচে থাকলেও তার খবর পাওয়া দুষ্কর ছিল । ইউনুসের তখন জ্বরজ্বারি লেগেই থাকত। থেকে থেকে শেষরাতে কাশির দমক উঠত । তবু পাড়াটি সে ছাড়েনি একটিমাত্র কারণে । কে তাকে বলেছিল, চামড়ার গন্ধ নাকি যক্ষার জীবাণু ধ্বংস করে । দুর্গন্ধটা তাই সে অম্লানবদনে সহ্য-তো করতই, সময়-সময় আপিস থেকে ফিরে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির নিশ্ছিদ্র দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বুক ভরে নিশ্বাসও নিত ! তাতে অবশ্য তার স্বাস্থ্যের কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় নি । এরকম একটি পরিবেশ থেকে যারা উঠে এসেছে তাদের কাছে এত আলো-হাওয়া যুক্ত বাড়ি যে রাজমহলের মতো লাগবে তা খুব স্বাভাবিক ।

তবে ঠিক মত খাওয়া-দাওয়া না হলে রাজবাড়িও জমজমাট হয় না । তাই মতিনরা এক সপ্তাহ ধরে মোঘলাই কায়দায় খানাপিনা করে । অবশ্য রান্নার ব্যাপারে সবারই কোন না কোন গুপ্ত কেরামতি প্রকাশ পায় । কার নানির হাতে শেখা বিশেষ কৌশলে তৈরি পিঠাটি শেষ পর্যন্ত অখাদ্য বস্তুতে পরিণত হলেও তারিফ প্রশংসায় তা মুখরোচক হয়ে ওঠে । গানের আসরও বসে কোনো কোনো সন্ধ্যায় । হাবিবুল্লা কোত্থেকে একটা বেসুরো হারমোনিয়াম নিয়ে এসে তার সাহায্যে নিজের গলার বলিষ্ঠতার ওপর ভর করে নিশীথ রাত পর্যন্ত একটি অব্যক্ত সঙ্গীতসমস্যা সৃষ্টি করে । এভাবেই তাদের দিন চলছিল । কিন্তু এক রোববারের সকালে মোদাব্বরের চিৎকারে সে আনন্দের সুর কেটে যায় --

*''লোকটি এমনিতেই হুজুগে মানুষ । সামান্য কথাতেই প্রাণ-শীতল-করা রৈ-রৈ আওয়াজ তোলার অভ্যাস তার । তবু সে-আওয়াজ উপেক্ষা করা সহজ নয় । শীঘ্রই কেউ-কেউ ছুটে আসে উঠানে ।*

*কী ব্যাপার ?*

*চোখ খুলে দেখ !*

*কী ? কী দেখব ?*

*সাপখোপ দেখবে আশা করেছিল বলে প্রথমে তুলসীগাছটা নজরে পড়ে না তাদের । দেখছ না? এমন বেকায়দা আসনাধীন তুলসীগাছটা দেখতে পাচ্ছ না ?*

*উপড়ে ফেলতে হবে ওটা । আমরা যখন এ-বাড়িতে এসে উঠেছি তখন এখানে কোনো হিন্দুয়ানির চিহ্ন আর সহ্য করা হবে না ।*

*একটু হতাশ হয়ে তারা তুলসীগাছটার দিকে তাকায় । গাছটি কেমন যেন মরে আছে ।গায় সবুজ রঙের পাতায় খয়েরি রঙের রং ধরেছে । নিচে আগাছাও গজিয়েছে । হয়তো বহুদিন তাতে পানি পড়ে নি ।*

*কী দেখছ ? মোদাব্বের হুঙ্কার দিয়ে ওঠে । বলছি না । উপড়ে ফেল !*

*এরা কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে থাকে । আকস্মিক এ-বাড়িতে তারা যেন কিছুটা হতভম্ব হয়ে পড়েছে । যে-বাড়ি এত শূণ্য মনে হয়েছিল, ছাদে যাওয়ার সিঁড়ির দেয়ালে কাঁচা হাতে লেখা-কটা নাম থাকা সত্ত্বেও যে-বাড়িটা এমন বেওয়ারিশ ঠেকেছিল, সে- বাড়ির চেহারা যেন হঠাৎ বদলে গেছে । আচমকা ধরা পড়ে গিয়ে শুষ্কপ্রায় মৃতপ্রায় নগণ্য তুলসীগাছটি হঠাৎ সে-বাড়ির অন্দরের কথা প্রকাশ করেছে যেন ।*

*এদের অহেতুক স্তব্ধতা লক্ষ্য করে মোদাব্বের আবার হুঙ্কার ছাড়ে ।*

*ভাবছ কী অত ? উপড়ে ফেল বলছি !*

*কেউ নড়ে না । হিন্দু রীতিনীতি এদের তেমন ভালো করে জানা নাই । তবু কোথাও শুনেছে যে, হিন্দুবাড়িতে প্রতি দিনান্তে গৃহকর্ত্রী তুলসীগাছের তলে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায়, গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে । আজ যে-তুলসীগাছের তলে ঘাস গজিয়ে উঠেছে, সে-পরিত্যক্ত তুলসীগাছের তলেও প্রতি সন্ধ্যায় কেউ প্রদীপ দিত । আকাশে যখন সন্ধ্যাতারা বলিষ্ঠ একাকিত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠত তখন ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে আনত সিঁদুরের নীরব রক্তাক্ত স্পর্শে একটি শান্ত প্রদীপ জ্বলে উঠত প্রতিদিন । ঘরে দুর্দিনের ঝড় এসেছে, হয়তো কারো জীবন প্রদীপ নিভে গেছে, আবার হাসি-আনন্দের ফোয়ারাও ছুটেছে সুখ সময়ে, কিন্তু এ-প্রদীপ-দেওয়া অনুষ্ঠান একদিনের জন্যেও বন্ধ থাকে নাই ।*

*যে-গৃহকর্ত্রী বছরের পর বছর এ-তুলসীগাছের তলে প্রদীপ দিয়েছে সে আজ কোথায় ? মতিন এক সময়ে রেলওয়েতে কাজ করত । অকারণে তার চোখের সামনে বিভিন্ন রেলওয়ে পট্টির ছবি ভেসে ওঠে ।ভাবে, হয়তো আসানসোল, বৈদ্যবাটি, লিলুয়া বা হাওড়ায় রেলওয়ে-পট্টিতে সে-মহিলা কোনো আত্মীয়ের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে । বিশাল ইয়ার্ডের পাশে রোদে শুকোতে-*

*থাকা লাল পাড়ের একটি মসৃণ কালো শাড়ি সে যেন দেখতে পায় । হয়তো সে-শাড়িটি গৃহকর্ত্রীরই । কেমন বিষণ্নভাবে সে-শাড়িটি দোলে স্বল্প হাওয়ায় । অথবা মহিলাটি কোন চলতি ট্রেনের জানালার পাশে যেন বসে আছে । তার দৃষ্টি বাইরের দিকে । সে দৃষ্টি খোঁজে কিছু দূরে, দিগন্তের ওপারে । হয়তো তার যাত্রা এখনো শেষ হয় নাই । কিন্তু যেখানেই সে থাকুক এবং তার যাত্রা এখনো শেষ হয়েছে কি হয় নাই, আকাশে যখন দিনান্তের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে তখন প্রতিদিন এ-তুলসীতলার কথা মনে হয় বলে তার চোখ হয়তো ছলছল করে ওঠে।''*[৩১]

সকলের মনই তাদের অজান্তে এবাড়ির বাসিন্দা বিশেষ করে সেই অদেখা গৃহকর্ত্রীর প্রতি সমবেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে । তাই কারো হাতই গাছটি উপড়ানোর জন্য এগিয়ে আসে না । ইউনুস তুলসীগাছের ওষধি গুণের কথা বলে গাছটিকে রাখার পক্ষে সওয়াল করে। অন্যরা নীরবে তা সমর্থন করে ।এমনকি মুখে দাড়ি রাখা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া,নিয়মিত কোরাণ-তালাওয়াত করা মৌলবী ধরনের মানুষ এনায়েতও কিছু বলে না । বরং কয়েকদিন পর রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মোদাব্বের বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করে তুলসীগাছটির রীতিমত যত্ন করছে বাড়িরই কোন বাসিন্দা--

*''তার তলে যে- আগাছা জন্মেছিল সে- আগাছা অদৃশ্য হয়ে গেছে । শুধু তাই নয় । যে-গাঢ় সবুজ পাতাগুলি পানির অভাবে শুকিয়ে খয়েরি রং ধরেছিল, সে-পাতাগুলি কেমন সতেজ হয়ে উঠেছে । সন্দেহ থাকে না যে তুলসীগাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ । খোলাখুলিভাবে না হলেও লুকিয়ে-লুকিয়ে তার গোড়ায় কেউ পানি দিচ্ছে । মোদাব্বরের হাতে তখন একটি কঞ্চি । সেটি শাঁ করে কচু-কাটার কায়দায় সে তুলসীগাছের ওপর দিয়ে চালিয়ে দেয় । কিন্তু ওপর দিয়েই । তুলসীগাছটি অক্ষত দেহেই থাকে ।''*[৩২]

এভাবেই তাদের দিন কেটে যাচ্ছিল । কিন্তু ওদের এই সুখ বেশিদিন টেকে না । পুলিশ এসে ঘোষণা করে সরকার বাড়িটি রিকুইজিশন করেছে । বাড়ির দখল ছেড়ে দিয়ে পুনরায় তাদের ঘর-ছাড়া হতে হয় । আর গল্পের শেষে আমরা আবিষ্কার করি কোথায় যেন মতিন, কাদের, মোদাব্বের, ইউনুস, এনায়েতদের ভাগ্য ও তুলসীগাছের ভাগ্য মিলেমিশে এক হয়ে যায় । পুনরায় ঠাঁই নাড়া হতে হয় তাদের--

*''.....দশম দিনে তারা সদলবলে বাড়ি ত্যাগ করে চলে যায় । যেমনি ঝড়ের মতো এসেছিল, তেমনি ঝড়ের মতোই উধাও হয়ে যায় । শূণ্য বাড়িতে তাদের সাময়িক বসবাসের*

*চিহ্নস্বরূপ এখানে-সেখানে ছিটিয়ে-ছড়িয়ে থাকে খবর কাগজের ছেঁড়া পাতা, কাপড় ঝোলাবার একটা পুরোনো দড়ি, বিড়ি-সিগারেটের টুকরো, একটা ছেঁড়া জুতোর গোড়ালি ।*

*উঠানের শেষে তুলসীগাছটা আবার শুকিয়ে উঠেছে । তার পাতায় খয়েরি রং । সেদিন পুলিশ আসার পর থেকে কেউ তার গোড়ায় পানি দেয় নি । সেদিন থেকে গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও আর কারো মনে পড়ে নি ।*

*কেন মনে পড়েনি সে-কথা তুলসীগাছের জানবার কথা নয়, মানুষেরই জানবার কথা ।'*[৩৩]

গল্পটিতে শেষ পর্যন্ত তুলসীগাছটি শুধুমাত্র একটি গাছ হয়েই থাকেনি সে হয়ে উঠেছে মানবতার প্রতীক । যা সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে । যে মানবতাকে মানুষ চাইলে বাঁচাতে পারে আবার না চাইলে নিজের হাতেই তাকে ধ্বংস করে দিতে পারে । আসলে 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' বাংলাদেশের সমাজের এককালীন সংকট, দেশবিভাগপীড়িত মানুষের অস্তিত্ব-অন্বেষার রূপকল্প, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ও মানবপ্রেমী চৈতন্য, তাঁর সমকালকে স্পর্শ করে কালান্তরে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টারই এক আলেখ্য, রূপবর্ণিমা যা একটি বিশেষ রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার পটভূমিতে রচিত হওয়া সত্ত্বেও কোন প্রচারধর্মী উচ্ছ্বাস স্থান পায়নি । সাময়িক ঘটনা এখানে উপলক্ষ মাত্র আসলে এতে চিরন্তন মানব-মনের বার্তাই পরিবেশিত হয়েছে । গল্পের শুরু যে ভাবেই হোক না কেন কাহিনি এক পাক ঘুরেই শেষ হয়েছে মানবিক গন্তব্যে : উচ্চারিত হয়েছে মানুষের জয়ধ্বনি । সাদাত হাসান মান্টোর 'টেবো টেক সিং' কৃষাণ চন্দরের 'অমৃতসর, ইসমত চুগতাই -এর 'বাচ্চা', রাজেন্দ্র সিং বেদীর 'লাজবন্তী'- এর মতই ভারতীয় উপমহাদেশে দেশভাগ নিয়ে রচিত কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গল্পের একটি 'তুলসী গাছের কাহিনী' ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে পারিপার্শ্বিক পরিমন্ডল একজন লেখকের উপর ঠিক কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে । পূর্বেই বলেছি পরিচিত জনের ক্ষেত্রে ওয়ালীউল্লাহের পরিমন্ডল ছিল বরাবরই সীমায়িত । আর তাঁর এই সীমায়িত পরিমন্ডলই তাঁকে তাঁর লেখার একটি বিশেষ স্টাইলও তৈরি করে দিয়েছে । কীভাবে ? আমরা একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারব সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের চরিত্ররা বরাবরই মুখের চেয়ে মনেতেই অধিক কথা বলে । এক্ষেত্রে আমরা যেন চরিত্রদের পেছনে ওয়ালীউল্লাহের ছায়া দেখতে পাই । দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও অসীম গাম্ভীর্যের অধিকারী ওয়ালীউল্লাহ্‌ বরাবরই কম কথা

বলতেন ।বরং তিনি ছিলেন একজন ভালো শ্রোতা ।তাঁর এক বন্ধুস্থানীয় ও সমসাময়িক লেখকের ভাষায়--

*''.....খুব কম কথা বলতেন, ধীরে ধীরে প্রায় অস্পষ্ট উচ্চারণে । চেহারায়, বিশেষ করে মুখে, বুদ্ধির সুস্পষ্ট ছাপ, কিন্তু বেজায় লাজুক । যতো কথা বলতেন তাঁর চেয়ে কাজ করার ঝোঁক ছিলো বেশি । .....ওয়ালীউল্লাহ্ কোনো কাজেই খুব মাতামাতি করতেন না । তাঁর ভেতরে যে আন্দোলন, বাইরে তাঁর ছাপ খুব কম পড়তো ।'*[৩৪]

তাঁর এই অন্তর্মুখী স্বভাবের জন্যই হয়ত তাঁর অধিকাংশ রচনাই চেতনাপ্রবাহ রীতিতে রচিত। কারণ তাঁর তিনটি বাংলা উপন্যাসই যথাক্রমে--

লালসালু (১৯৪৮)

চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪)

কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮)

চেতনাপ্রবাহরীতির অন্যতম উদাহরণ । প্রায় সকল রচনাতেই ওয়ালীউল্লাহের নায়কেরা তাঁর স্রষ্টার মত যেমন স্বল্পভাষী তেমনি আবার তারা নিঃসঙ্গও বটে । লালাসালু-র মজিদ, চাঁদের অমাবস্যা-র আরেফ আলী, কাঁদো নদী কাঁদো-র মুহাম্মদ মোস্তফা, জাহাজী গল্পের সারেঙ্গ, বহিপীর নাটকের বহিপীর সকলের ক্ষেত্রেই তাঁর ঝোক মনঃসমীক্ষণের দিকে । সকলেই মনুষ্যজন্মের অন্তর্লীন মুক্তি খুঁজে পেতে আগ্রহী । বৃদ্ধ করিম সারেঙ্গ বা ধর্মব্যবসায়ী শঠ মজিদের মনে যে প্রশ্নাবলী উত্থিত হয়, কিংবা যুবক শিক্ষক আরেফ আলীর মনে সে সব জীবন জিজ্ঞাসা এত নান্দনিক, সাত্তিক ও মেধাবী যে নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত মানুষের তা বোধশক্তির বাইরে রয়ে যাওয়ার কথা । ঈশ্বর ও তার সৃষ্ট পৃথিবীর ভিতরে গোপন সম্পর্ক সূত্র বস্তুতপক্ষে তারা খোঁজে না, খোঁজেন শিল্পী নিজে ।

*''আমি কত উন্মূল, এখন বলা চলে আবার ঘরে (ঢাকা) ফিরে এসেছি, কিন্তু এখানে কাকে চিনি আমি ? বস্তুত কাউকে না । বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি ছাড়া আমি কারো বাড়িতে যাই না। বন্ধুদের বাড়িতে গেলে সেখানে খাই । যে কয়েকজন মাত্র বন্ধু আছে আমার তারা শুধুই বন্ধু, বলা চলে সাধারণ বন্ধু, তারাও দু'জনের বেশি হবে না । লেখক হিসেবে অনেকে আমাকে চেনে, কিন্তু আমি তাদের চিনি না, হয়তো তাদের আমার ভালো লাগবে না । আত্মীয় সম্পর্কের কথা বলতে গেলে ভাই ছাড়া কারো সঙ্গে সম্পর্ক নেই । আমার কাছে বাকিদের কোনো অস্তিত্ব নেই । তাদের সঙ্গে আমি দেখা করি না, তারাও দেখা করে না*

*আমার সঙ্গে । এমনকি আমার সঙ্গে আমার সৎ বোনদের কোনো সম্পর্ক নেই (তারা ঢাকায় থাকে না) । তারা কেউ আমাকে চিঠি লেখে না, আমিও তাদের কাউকে চিঠি লিখি না । নিজেকে আমার সম্পূর্ণ উন্মূল মনে হয়, যেন আমার নিজের বলে কোনো জায়গা নেই । আমি নিঃসঙ্গ, ভীষণ নিঃসঙ্গ । আমার মতো নিজেকে এমন নিঃসঙ্গ আর কেউ বোধ করে বলে মনে হয় না । এটা কি ভালো না খারাপ ?*

*হয়তো এক দিক দিয়ে এতে আমি উপকৃত হই, এর ফলে হয়তো যেকোন প্রথা ভাঙা আমার জন্য সহজ হয়ে যায়, মনের দিক থেকে আমি যেকোন জায়গাকে আমার নিজের জায়গা বলে মনে করতে পারি । কিন্তু মানসিকভাবে আমার এই একাকিত্ব এবং কারো ভালোবাসা না পাওয়াটা খারাপ । যেসব পরিবারে অনেক সদস্য, অনেক ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, তাদের দেখে আমার হিংসা হয় । উষ্ণতা আর খাঁটি মানবিক সম্পর্কের কারণে এ জাতীয় সঙ্গ অনেক ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে পূর্ণতার অনুভূতি এনে দেয় । এটি (সম্ভবত) স্বামী বা স্ত্রীর ভালোবাসার মতোই জরুরি ''*[৩৫]

১৯৫৪ সালে লিখিত এই পত্রে লক্ষণীয় বিষয় তিনি নিজের দেশ, নিজের শহরে এসেও নিজেকে নিঃসঙ্গ এবং উন্মূল ভেবেছেন । প্রকৃতপক্ষে ওয়ালীউল্লাহ্‌র এই নিঃসঙ্গতার জন্য দায়ী তাঁর শৈশব, কৈশোর এবং কর্মজীবন । আজন্ম স্থির ও স্থায়ী হয়ে কোথাও তিনি বসবাস করতে পারেননি । যাযাবরের মত পিতার কর্মস্থলগুলোয় ঘুরে বেড়িয়েছেন । কারণ তাঁর পিতার ছিল বদলির চাকরি । পূর্বেই জানিয়েছি পিতার বদলির কারণে তাঁকে একটির পর একটি বিদ্যালয় পরিবর্তন করতে হয়েছে । ফলে নির্দিষ্ট কোন বিদ্যালয় ও সে এলাকার স্মৃতি দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার পূর্বেই তাঁকে সে সব ছেড়ে যেতে হয়েছে পিতার নতুন কর্মস্থানে । সেখানে ভিন্ন পরিবেশে অচেনা সহপাঠী ও অপরিচিত এলাকাবাসীর সঙ্গে নতুন করে ঘনিষ্ঠ, আন্তরিক ও অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় সময় তিনি পাননি । এর ফলে মানুষ হিসেবে তিনি তাঁর স্বদেশের কোন নির্দিষ্ট মৃত্তিকার মর্মমূলে শিকড়ায়িত হতে পারেননি এবং কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীকে ভাবতে পারেননি একান্ত আপন, আজন্মের চেনা বলে । তাই সবসময়েই একধরণের সীমাহীন একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতাবোধ তাঁকে ঘিরে রেখেছে । শৈশব কৈশোরের মত পরবর্তীতে কর্মজীবনেও তিনি নির্দিষ্ট কোন স্থানে স্থায়ী হয়ে বসবাস করতে পারেননি । কর্মসূত্রে তাঁকে পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে । পরে অবশ্য এই ঘুরে বেড়ানোটা

তাঁর নেশাতে পরিণত হয়েছিল । কাজের সূত্রে তিনি যে সমস্ত স্থানে ঘুরেছেন সেদিকে দৃষ্টি ফেরালেই আমরা বুঝতে পারব তিনি পৃথিবীর কতস্থানে ঘুরেছেন--

১. ভারত -১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ (কলকাতায় দ্য স্টেটস্ম্যান পত্রিকায় সাংবাদিকতা)

২. বাংলাদেশ -১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ (ঢাকায় রেডিও পাকিস্তানের সহকারী বার্তা সম্পাদক)

৩. পাকিস্তান -১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ (করাচি কেন্দ্রে বার্তা সম্পাদক)

৪. ভারত -১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ (নয়াদিল্লিতে পাকিস্তান দূতাবাসের তৃতীয় সেক্রেটারীর পদমর্যাদায় প্রেস আতাশে)

৫. অস্ট্রেলিয়া - ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ (সিডনি শহরে পাকিস্তান দূতাবাসের তৃতীয় সেক্রেটারীর পদমর্যাদায় প্রেস আতাশে)

৬. বাংলাদেশ - ১৯৫৪ (ঢাকায় তথ্য অফিসার)

তথ্য মন্ত্রণালয় দপ্তর)

৭. পাকিস্তান - ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ (করাচিতে তথ্য মন্ত্রণালয় দপ্তর)

৮. ইন্দোনেশিয়া - ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ (জাকার্তার দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার তথ্য পরিচালক অফিসার)

৯. ইন্দোনেশিয়া - ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ (জাকার্তায় প্রেস আতাশে)

১০. ফ্রান্স - ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ (পারি শহরে পাকিস্তান দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী)

১১. ফ্রান্স - ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ (ইউনেস্কোর প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট)

প্রকৃতপক্ষে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের কর্মজীবন শুরু হয় তাঁর পাঠদ্দশাতেই । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়া চলাকালীন । পরে ১৯৪৫ সালে স্টেট্সম্যান পত্রিকার চাকরি ছেড়ে ঢাকা চলে আসেন রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রের সহকারী বার্তা সম্পাদক হয়ে । এরপর করাচি কেন্দ্রে বার্তা সম্পাদক হয়ে ঢাকা ছাড়েন ১৯৪৮ সালে । সেখান থেকে নয়াদিল্লীতে পাকিস্তান দূতাবাসে তৃতীয় সেক্রেটারীর পদমর্যাদায় প্রেস আতাশে হয়ে যান ১৯৫১ সালে । অতঃপর একই পদে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে বদলি হন ১৯৫২ সালের শেষের দিকে । পরে ১৯৫৪ সালে ঢাকা ফিরে আসেন তথ্য অফিসার হিসেবে ঢাকার আঞ্চলিক তথ্য অফিসে। ১৯৫৫ সালে পুনরায় পাকিস্তানের করাচিতে তথ্য মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন । এরপর ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার তথ্য পরিচালকের পদাভিষিক্ত হন ১৯৬৫-এর জানুয়ারীতে । দেড় বছর পর এই পদটি বিলুপ্ত হয়ে গেলে জাকার্তার পাকিস্তান দূতাবাসে তৃতীয় সেক্রেটারীর পদমর্যাদায় প্রেস আতাশে হয়ে রয়ে গেলেন ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর

অবধি। এরপর ক্রমান্বয়ে করাচি, লন্ডন, বন বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন পদে । ১৯৬১ সালের এপ্রিলে ফার্স্ট সেক্রেটারীর পদমর্যাদায় প্রেস আতাশে হিসেবে যোগ দিলেন পারীর পাকিস্তানি দূতাবাসে । একনাগারে ছ'বছর ছিলেন তিনি এ শহরে । এরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল 'লালসালু'-র ফরাসি অনুবাদ লয়েব্র সাঁ রাসিন Labre sans racines অর্থাৎ শিকড়হীন গাছ। দূতাবাসের চাকরি থেকে চুক্তিভিত্তিক পদ, প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট হিসেবে যোগ দেন ইউনেস্কোতে । চাকরিস্থল ফ্রান্সের পারী শহর । ঐ বছরই লন্ডলের শ্যাটো এ্যান্ড উইন্ডস প্রকাশনায় লালসালুর ইংরেজী ভাষান্তর বের করে Tree Without Roots নাম দিয়ে ঔপন্যাসিকের নিজেরই করা অনুবাদে । ১৯৭০ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর ইউনেস্কোয় তাঁর চাকরির মেয়াদ শেষ হলে পাকিস্তান সরকার তাকে ইসলামাবাদে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেয় । কিন্তু তিনি রাজি না হয়ে পারীতেই থেকে যান ।

এভাবে চাকরি সূত্রে তিনি যেমন ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স, প্রভৃতি দেশ ঘুরেছেন তেমনি ভ্রমণপিপাসু হিসেবে ঘুরেছেন ইন্দোচীন, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, ফিলিপাইন, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশ । লক্ষ্য করার বিষয় কাজের সূত্রে তাঁকে যেমন বিভিন্ন দেশে যেতে হয়েছে তেমনি তাঁর পদমর্যাদাও হয়েছে বারবার পরিবর্তিত । ফলে কোন বিশেষ দেশ বা বিশেষ বিভাগের প্রতি আলাদা করে কোন টান সেভাবে গড়ে ওঠেনি । একারণে শারীরিক ও মানসিকভাবে তিনি ছিলেন একাধারে বহু ভুবনের বাসিন্দা যা যে কোন লেখক বা শিল্পীর জন্য বিরল সুযোগ ।

কর্মসূত্রে পৃথিবী ব্যাপী নানা দেশে ঘুরে বেড়ানোর সুবাদে তিনি নিজেকে যেমন উন্মুল ভেবেছেন তেমনি আবার এই কাজের সুবাদেই তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বাদ রসাস্বাদন করতে পেরেছেন । বিভিন্ন দেশ ও সেই দেশের মানুষ সম্পর্কে ওয়ালীউল্লাহের ছিল প্রবল কৌতূহল ও অপার অনুসন্ধিৎসা । চাকরি সূত্রে পৃথিবীর যে দেশেই গিয়েছেন সে দেশ ও সে দেশের মানুষ, সমাজ সংগঠন, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও শিল্প সংস্কৃতি তার গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে । একজন বাঙালি পাঠক হিসেবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি বরাবরই সচেতন ছিলেন । এছাড়াও নয়াদিল্লি ও পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানকালে তিনি হিন্দি, উর্দু ও অন্যান্য উপমহাদেশীয় সাহিত্যের চরিত্র সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করেন । দীর্ঘদিন অস্ট্রেলিয়া ও ব্রিটেনে অবস্থান করে সেখানকার শিল্পসাহিত্যের মেজাজ, চরিত্র ও অগ্রগতি সম্পর্কে অসামান্য জ্ঞান অর্জন করেন । জার্মানি

থেকে ক্লাসিক জার্মান সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধোত্তর নতুন সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে সুষ্ঠ ধারণা অর্জন করেন । তিনি খুব ভালো ফরাসি না জানলেও ফরাসি সাহিত্যের যে সমস্ত গ্রন্থ ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছিল তার প্রায় সমস্তই তিনি পড়েছিলেন । পড়ার ব্যাপারে তাঁর যে কোন বাছ বিচার বা উন্নাসিকতা ছিল না তা আমরা জানতে পারি শ্রীমতি অ্যান-মারি ওয়ালীউল্লাহ্‌র কাছ থেকে । তিনি আমাদের জানিয়েছেন--

*''ও ছিল এক সর্বভুক পাঠক ; ওর পড়ার কাজটা বেশির ভাগ ছাত্রাবস্থাতেই হয়েছে। তার ঢাকার বন্ধুবান্ধব সৈয়দ নুরুদ্দিন, সানাউল হক, নাজমুল করিম, শওকত ওসমান, মুনীর চৌধুরী প্রমুখের সঙ্গে এসব নিয়ে আলাপ-আলোচনা করত । তার পড়াশোনার পরিধি খুবই বিস্তৃত ছিল । মার্ক্স, এঙ্গেলস, টয়েনবি, কাসিরের, কাফকা, লোরকা প্রমুখ লেখকদের লেখাও তার ভালো করা পড়া ছিল ।''*[৩৬]

শুধুমাত্র অবাঙালি সাহিত্য পাঠই নয় তিনি বহু অবাঙালি খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের সংস্পর্শেও এসেছিলেন । যেমন ইলা চাঁদ যোশী, খাজা আহমদ আব্বাস, ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ, ইসমত চুখতাই, মুল্‌ক রাজ আনন্দ, কুদরতউল্লাহ শাহার, প্যাট্রিক হোয়াইট, ম্যাক্স ফিস, ইভান গল, ডোরিস লেসিং, হাইনরিস বোয়েল, গ্রাহাম গ্রীন, স্টেফেন স্পেডার, সিরিল কনোলী, জন স্টানবেক, ই. এম. ফস্টার, সল বেল্লো, ব্লাদিমির নবোকভ, কম্পটন ম্যাকেঞ্জি, এলাজো কায়পেন্টিয়ার, আয়ানেস্কো, আর্তুরো ক্যামাসো রামিরেজ, হলিও কোর্তোজার, হুয়ান সারিনেল্লা, ক্লদসিমো, জর্জ এডুয়ার্ডস, গেব্রিয়েল মার্কেজ, ক্লদ লেভি স্ট্রস, রোলা বার্থ, জাঁ লাফা লিও পোল্ড সংখোর, বার্টিন ভালসরয়, অকটাভিও পাজ, পাবলো নেরুদা, আদ্রে মালবো, লুই অরাগ, জাঁ পল সাত্রে, জাঁ বার্ক প্রমুখ। একথা ঠিক কূটনীতিকের চাকরির সুবাদে ওয়ালীউল্লাহ্‌র পক্ষে এঁদের সাক্ষাৎ পাওয়া সহজ ছিল, কিন্তু 'লালসালু-র ফরাসি ও ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ হওয়ার পর শুধু একজন পাকিস্তানি কূটনীতিক বা ইউনেস্কোর পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে নয় লেখক হিসেবেও তিনি নিজের পরিচয় দেবার সুযোগ পান । এভাবে কর্মসূত্রে তিনি সান্নিধ্য পান এশিয়া, আফ্রিকা, উত্তর  দক্ষিণ আমেরিকার সংখ্যাহীন খ্যাত-অখ্যাত লেখক এবং বুদ্ধিজীবীদের ।

এসব কারণেই সম্ভবত ওয়ালীউল্লাহ্‌র বেশ কিছু রচনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতীচ্যের প্রভাব রয়েছে । তবে এ প্রভাব বিভিন্ন রকম । হতে পারে তা দর্শনগত বিচারে আলবেয়ার কাম্যুর অস্তিত্ববাদ অথবা প্রকরণগত বিচারে জেমস্ জয়েসের চেতনাপ্রবাহ রীতির

প্রভাব । জা পল সার্ত্র, আলবেয়ার কাম্যু, ফ্রানস কাফকা, দস্তভয়েস্কি, জেমস জয়েস, যোসেফ কনরাড প্রমুখ প্রতীচ্যের সাহিত্যিকদের প্রভাব সাধারণত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায় ।

প্রকৃতার্থে কোন প্রতিভাই ঐতিহ্যরিক্ত ও আকাশচারী সত্তা নয় । বাল্য ও কৈশোরের প্রস্তুতি ও পটভূমির উপর দাঁড়িয়েই মানুষ যৌবনে প্রবেশ করে । জীবনের মত শিল্পেও তা সমান সত্য । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ও জীবনের প্রথম পর্বের সঞ্চিত ঐশ্বর্য, অনুভূতি ও অর্ন্তদৃষ্টিকে নিজের গভীরে আত্মস্থ ও লালন করেই উপস্থিত হয়েছেন জীবন দর্শনের তটভূমিতে । সাহিত্যচর্চায় তিনি চূড়ান্ত পরিশুদ্ধ, সর্বাধিক পরিশীলন, পরিমার্জন এবং শিল্প সিদ্ধিতে বিশ্বাসী ছিলেন । হয়ত নিজে চিত্রশিল্পী ছিলেন বলেই ফরমায়েসি বা অপরিণত লেখার প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল না । সাহিত্যে একটি স্বতঃস্ফূর্ততার নীতিতেই আস্থাবান ছিলেন। কোন কষ্টকল্পনা বা কোন তত্ত্বের অভিসন্দর্ভরূপে সাহিত্যকে নির্মাণের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না । তাই বলেছেন--

*''সাহিত্যিক হতে হবে ব'লে লেখা-সে আমি ঘৃণা করি । প্রাণের উৎস থেকে না বেরুলে সে আবার লেখা ! আপনা থেকে যা বেরুবে তাই খাঁটি.....''*[৩৭]

মোটকথা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যকর্ম, তাঁর গল্প, উপন্যাস ও নাটক তাঁর সমগ্র জীবনদর্শনের শব্দরূপ ও সযত্নসৃষ্ট অভিজ্ঞান । অন্যকথায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনবোধ ও তাঁর প্রতিভা শক্তির রূপকল্পই হচ্ছে তাঁর সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস এবং নাটক । বাংলা সাহিত্যের মহান এই কথাসাহিত্যিক ১৯৭১ সালের ১০-ই অক্টোবর ফ্রান্সের পারীতে চিরনিদ্রায় শায়িত হন ।

**তথ্যসূত্র :**


১. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র - 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ: ভূমিকা'

২. ওয়ালীউল্লাহ্‌, সৈয়দ - 'সীমাহীন এক নিমেষে', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ গল্পসমগ্র, প্রতীক প্রকাশনী, ১৯৯৬, বাংলাদেশ, পৃ-১২০

৩. ঐ, পৃ-১২১

৪. ঐ, পৃ-১২২-১২৩

৫. পাগড়ি, পৃ- ৭৫, ঐ

৬. খন্ড চাঁদের বক্রতায়', পৃ-৪০, ঐ

৭. ঐ, পৃ- ৪৬

৮. মকসুদ, সৈয়দ আবুল - সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য, মনন প্রকাশ, ২০০৮, বাংলাদেশ, পৃ-৩৪-৩৫

৯. ওয়ালীউল্লাহ্‌, অ্যান-মারি - আমার স্বামী ওয়ালী, অনুবাদ, শিবব্রত বর্মন, প্রথমা প্রকাশন, ২০১২, বাংলাদেশ, পৃ-৩৯

১০. ঐ, পৃ- ৪৩

১১. ঐ, পৃ- ৫৫

১২.করিম এ.কে. নাজমুল - ইত্তেফাক, ১৮ অক্টোবর ১৯৭১

১৩.ওয়ালীউল্লাহ্‌, অ্যান-মারি - আমার স্বামী ওয়ালী, অনুবাদ, শিবব্রত বর্মন, প্রথমা প্রকাশন, ২০১২, বাংলাদেশ, পৃ-৪৪

১৪.নাসির আলী, মোহাম্মদ - কথাশিল্পীর চিত্রশিল্প, ইত্তেফাক ১৮ অক্টোবর ১৯৭১

১৫.ওয়ালীউল্লাহ্‌, সৈয়দ - 'নানির বাড়ির কেল্লা', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, গল্পসমগ্র, প্রতীক প্রকাশনী, ১৯৯৬, বাংলাদেশ, পৃ-৩০১

১৬.মকসুদ, সৈয়দ আবুল - সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য, মনন প্রকাশ,২০০৮, বাংলাদেশ, পৃ-৫৯-৬০

১৭.ওয়ালীউল্লাহ্‌, অ্যান-মারি - আমার স্বামী ওয়ালী, অনুবাদ-শিবব্রত বর্মণ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১২, বাংলাদেশ, পৃ-৪৬

১৮.ওয়ালীউল্লাহ্‌, অ্যান-মারি, আমার স্বামী ওয়ালী, অনুবাদ-শিবব্রত বর্মণ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১২, বাংলাদেশ, পৃ-৪৭

১৯.মকসুদ, সৈয়দ আবুল - সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য, মনন প্রকাশ, ২০০৮, বাংলাদেশ, পৃ-৫৯-৬০

২০.আবদুল, সৈয়দ মান্নান - সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, অগ্রন্থিত রচনাগুচ্ছ অপ্রকাশিত আলোকচিত্রাবলি, অবসর প্রকাশনী, ২০০১, বাংলাদেশ, পৃ-১৩১-১৩৮

২১.ওয়ালীউল্লাহ্‌, সৈয়দ - অগ্রন্থিত রচনাগুচ্ছ অপ্রকাশিত আলোকচিত্রাবলি, আবদুল মান্নান সৈয়দ, অবসর প্রকাশনী, ২০০১, বাংলাদেশ, পৃ-১৪২-১৪৪

২২.মকসুদ, সৈয়দ আবুল - সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য, মনন প্রকাশ, ২০০৮, বাংলাদেশ, পৃ-৪৪

২৩. ঐ, পৃ-৩৫-৩৬,

২৪.সেন, সুকুমার - বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস, পঞ্চম খন্ড, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৭৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা, পৃ-২৭৩-২৮১

২৫.পৌষ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, কল্লোল ।

২৬.মকসুদ, সৈয়দ আবুল - সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য, মনন প্রকাশ, ২০০৮, বাংলাদেশ, পৃ-৪৭,

২৭.কায়সার, শহীদুল্লা - সংশপ্তক, জোনাকী প্রকাশনী, ২০০০ বাংলাদেশ, পৃ-৩৬৬-৩৬৯

২৮.চট্টোপাধ্যায়, রিন্টু - 'ফ্ল্যাশ ব্যাক' স্মৃতিচারণ, অণুলিখন সাপ্তাহিক বর্তমান,'২০। ২৭শে জানুয়ারি, ১৯৯৬

২৯.সেন, সলিল - নতুন ইহুদী, দে'জ পাবলিশিং, ২০০২, পৃ-৯৬,

৩০.ওয়ালীউল্লাহ্‌, সৈয়দ - একটি তুলসী গাছের কাহিনী, গল্পসমগ্র, অবসর প্রকাশনা, ২০০৮ বাংলাদেশ, পৃ-৬৬

৩১.ঐ, পৃ-৬৮-৬৯

৩২.ঐ, পৃ-৭০

৩৩.ঐ, পৃ-৭১

৩৪.ঐ, পৃ-৭২

৩৫.মকসুদ, সৈয়দ আবুল - সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য, মনন প্রকাশ, ২০০৮, বাংলাদেশ, পৃ-১১৭

৩৬.ওয়ালীউল্লাহ্‌ অ্যান-মারি - আমার স্বামী ওয়ালী, অনুবাদ, শিবব্রত বর্মন, প্রথমা প্রকাশন, ২০১২, বাংলাদেশ, পৃ-৩৮,

৩৭.ঐ, পৃ-৩৯

৩৮.আলী জীনাত ইমতিয়াজ - সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম, নবযুগ প্রকাশনী, ২০০১, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ-১৭

---